পশ্চিমা বিশ্বের নামে খোলা চিঠি

মূল
মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ
মাওলানা জুলফিকার আলী নদভী

(26) مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں
از سید ابوالحسن علی ندویؒ
مترجم: مولانا ذوالفقار علی ندوی
ناشر: ادارہ قرآن ، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

এদারায়ে কুরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট — ২০০৯

প্রকাশক ◗ আরিফ বিল্লাহ, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০, স্বত্ব ◗ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ◗ নাজমুল হায়দায়
কম্পিউটার কম্পোজ ◗ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ◗
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত দশ টাকা মাত্র

Pashchima Bishwer Name Khola Chithi : Writer Mawlana Abul Hasan Ali NadaVi, Translated by Mawlana Zulfikar Ali Nadabi, Published by Edara-e-Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Date of Publication Agust 2009.

PRICE : TAKA ONE HUNDRED TEN ONLY

ISBN : 984-70109-0002-7

উৎসর্গ

নতুন ইসলামী বিশ্বের স্বপ্নদ্রষ্টা মুসলিম বিশ্বের যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও রাহবারে মিল্লাত হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

ও

আমার শ্রদ্ধেয় মামা ও মুরুব্বী, বিশিষ্ট আলেম আল্লামা নদভী (রহ.) একনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন ছাত্র মাওলানা আব্দুর রাযযাক নদভী ও আমার পিতা-মাতা

ও

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদবৃন্দ, যাঁদের নেক দৃষ্টি ও সঠিক তরবিয়তের কারণে দ্বীনি খেদমতের যোগ্য হয়েছি, তাদের কদম মুবারকে আমার এ নগণ্য প্রয়াস উৎসর্গ করলাম।

প্রকাশকের কথা

এদারায়ে কুরআন একটি ইসলামী প্রকাশনী। বাংলা ভাষায় ইসলামের খেদমত করা এবং বাংলা ভাষা-ভাষীদের খেদমতে ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেয়াই হল এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। আর এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে ইসলামী ঐতিহ্য নিয়ে রচিত উপন্যাস ও ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করার তৌফিক আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এবং তা পাঠকের সাধুবাদও গ্রহণ করেছে। যা আমাদেরকে প্রকাশনার জগতে অনুপ্রাণিত করেছে।

আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-কে বাংলাভাষী পাঠকের কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থগুলো বাংলাভাষায় প্রকাশ হয়ে পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। তাই ইচ্ছা ছিল এ মহামনীষীর কোন গ্রন্থ প্রকাশের। আর এ লক্ষ্যে আল্লামা নদভী (রহ.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র, খাদেম ও খলিফা মাওলানা জুলফিকার আলী নদভী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি "পশ্চিমা বিশ্বের নামে খোলা চিঠি" নামক গ্রন্থটি অনুবাদ করে এদারায়ে কুরআনকে প্রকাশের দায়িত্ব দেন। আমরা গ্রন্থটি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে প্রকাশের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, আমরা আশা করি উল্লেখিত গ্রন্থটি যেমন পশ্চিমা বিশ্বকে তার সংকট ও গোমরাহী থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করবে তেমনি বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দ তা থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও আলোকরশ্মি পেয়ে ধন্য হবে। আর এটি হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

পরিশেষে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদের সকল শ্রম ও মেহনত এখলাছের সাথে কবুল করেন, তাঁর ক্ষমা, মাগফিরাত ও জান্নাত লাভে ধন্য হই।

আরজগুজার
আরিফ বিল্লাহ

গ্রন্থকার

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) সেই যে গত শতকের তিনের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরুল-মু'মিনীন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরলভী (রহ.)-এর অনুপম চরিত্রগ্রন্থ 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ' লিখে তারুণ্য বয়সেই উর্দু সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন, তারপর বিগত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে চলেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত "তারিখে দাওযাত ও আযীমত' তাঁর এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর "মা-যা খাসিরাল-আলামু বি-ইন্‌হি'তাতি'ল-মুসলিমীন" (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?) একখানি, চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে।

'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও অতি সম্প্রতি রচিত 'আল মুরতাযা' শীর্ষক হযরত আলী (রা.) এর জীবনী গ্রন্থখানা আরবী, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চেয়ে অধিকতম খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোন আলেম ছিলেন কি না এবং থাকলেও তার মতো এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কি-না সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কারতুল্য মুসলিম বিশ্বের সবচাইতে মূল্যবান 'বাদশাহ্ ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন।

তিনি একাধারে 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম নাদওয়াতু'ল-উলামা'-এর রেক্টর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক বার তিনি বাংলাদেশ সফর করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৬

খণ্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সুক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর তাক্ওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (রহ.)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.), মাওলানা মনযুর নোমানী (রহ.) ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.) এবং মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরী (রহ.)-এর খলীফা।

তিনি বিগত ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার রমাজান মাসে সূরা ইয়াসিন পড়তে পড়তে জুমার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর তাঁর রবের সান্নিধ্যে চলে যান।

অনুবাদকের আরজ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبى وعلى عباد الله الصالحين ـ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে অধম অনুবাদকের দিল ও দেমাগ, জবান ও কলম, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সিজদা অবনত। কারণ মহান আল্লাহর তৌফিকেই ভাল কাজ সম্পাতি হয়। এখানে মাখলুকের কোন হাত নেই, থাকে না। আর এ কারণেই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এভাবে তাঁর কাছে দোয়া করতেন–

رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-কে বাংলাভাষী পাঠকের সামনে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলো পাঠকবৃন্দের হৃদয় আত্মাকে ব্যাপক নাড়া দিয়ে তাদের মাঝে আত্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেই সাথে তার গ্রন্থগুলো চেতনার দুয়ার উন্মোচন করতে ও কর্ম পন্থামূলক দিক-নির্দেশনা ও আলোর মশাল মুসলিম উম্মাহর হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, তাঁর উম্মতের ব্যথায় জাগ্রত রজনী ও দোয়া মুনাজাতের তপ্ত অশ্রুগুলো কলমের কালির আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফলে তা হৃদয় আত্মাকে নাড়া দিতে, মুসলিম উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তাদের জন্য কিছু করার আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থ "পশ্চিমা বিশ্বের নামে খোলা চিঠি" মূলত পশ্চিমা বিশ্বে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্র ও গবেষকদের সামনে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে পশ্চিমা বিশ্বের মুক্তির পথ।

আর এ মুক্তির পথ মানবতার ইজমালা সম্পদ। এ সম্পদ শুধু যে আরবদের এমন নয়, যেমন কোন ঔষধ, যা সেবন করলে যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মুক্তি পেতে পারে তা কারো একচ্ছত্র সম্পদ নয় বরং গোটা বিশ্ব মানবতার এবং তা গ্রহণ করতে কারো লজ্জাবোধ হয় না, বরং তা গ্রহণ না করাটাই হল বোকামী। ঠিক তদ্রূপ, ইসরাম গোটা বিশ্ব মানবতার ইজমালী সম্পদ, সুতরাং তা গ্রহণ না করাটাই বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা। এ বিষয়টি বর্তমান গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্য এদারায়ে কুরআন-এর স্বত্বাধিকারী আরিফ বিল্লাহ সাহেব এগিয়ে আসেন। তার অধিক আগ্রহের কারণেই অনুবাদের কাজে গতি সঞ্চারিত হয়। এ কাজে আরো সহযোগিতা করেন আমার স্নেহভাজন ভাই মুঈন। আল্লাহ্ পাক সকলের সহযোগিতাকে কবুল করেন এবং তাদের উত্তম প্রতিদান দান করেন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে দোয়া করি যেন তিনি অধমের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং আরো মহৎ কাজ করার তৌফিক দান করেন।

বিনীত
জুলফিকার আলী নদভী
মাদরাসাতুল হুদা
বাংলাদেশ
২০.০৪.০৯

কিতাব পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ আল-হাসানী
সম্পাদক আল-বাসুল ইসলামী

পশ্চিমা বিশ্বের উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষে আরোহণ করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া, মুসলিম বিশ্বের জন্য এক বড় দুর্ঘটনা থেকে কম ছিল না। কারণ মুসলিম বিশ্ব তৎকালীন সময়ে এর আকস্মিকতা ও তিক্ত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিল না. বরং তারা এ বিপদকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পারার কারণে সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্বপ্নে বিভোর ছিল। ফলে তারা পশ্চিমা বিশ্ব থেকে তুফানের বেগে আগত ঐ সকল চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-গবেষণার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর যখন এ তুফান একেবারে মাথার উপর এসে পড়ল এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব ও খেলাফত তাদের হাত থেকে চলে যেতে লাগল তখন তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে, এ তুফান থেকে বাঁচার মাত্র দু'টি পথ খোলা রয়েছে। প্রথম পথ হলো, একজন পরাজিত অফাদার বা আকুণ্ঠ অনুগত ও একান্ত বাধ্যগত ছাত্রদের রাস্তা। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, একজন দুশমন, পরাজিত ও পতিত সৈনিকের মত, যে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করা ছাড়া তার জীবন তিক্ত ও বিষাদ হয়ে রয়েছে। সে তার দুশমনের মাঝে কল্যাণের কোন দিক দেখতে ও ভাবতে প্রস্তুত নয়। এ দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার মত কিছু লোক প্রস্তুত হয়েছিল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা ও কর্মপদ্ধতি দ্বারা পশ্চিমা বিশ্বের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাদের অবস্থান ঐ সমস্ত লোকদের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যারা পশ্চিমা বিশ্বের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ও আস্থাশীল। তারা সর্ব অবস্থায় তাদের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের গীত গাইতে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থান হলো, ঐ সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং দেশপ্রেমিক লিডারদের, যারা সর্বাবস্থায় পশ্চিমা বিশ্বের ব্যাপারে রাজনৈতিকভাবে বেজার ও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে এবং পশ্চিমা বিশ্বকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে দেখে।

সুতরাং যদি আমরা প্রথম অবস্থানকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে, এর সমর্থক ও পতাকাবাহীগণ অত্যন্ত সীমিত চিন্তা-চেতনার মালিক। তাদের মন-মানসিকতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি একেবারেই স্বাভাবিক। তারা এর

আগে অগ্রসর হতে অক্ষম। কোন বিশাল ও বিস্তৃত দিগন্ত অথবা কোন সুউচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে নজর উঠাতে তারা অপারগ। তারা শুধু ইউরোপের ঐ সকল বিষয়বস্তুকে দেখে থাকে যে সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব অনুগত ও পরাভূত জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। অর্থাৎ, পশ্চিমা বিশ্বের শক্তির প্রদর্শনী এবং জীবনের বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও আরামদায়ক সাজ-সরঞ্জামের প্রতি তাদের নজর থাকে। এ দেখে তারা মনে করে যে, পশ্চিমারা তাদের রাহবারি করা ও পথিকৃৎ হবার এমন বাস্তবতা রাখে, যা অস্বীকার করা বা এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা প্রকাশ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাদের ধারণা, প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের কর্তৃত্ব আল্লাহ্ তায়ালার চূড়ান্ত ফয়সালা এবং স্বাভাবিক নিয়ম। এ যেন ইতিহাসের এক স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ঘটনা। পশ্চিমা বিশ্বের সাথে দ্বন্দ্ব রাখা এবং তাদের থেকে মুক্তির পথ তালাশ করা অথবা তাদের সাথে যুদ্ধের দামামা বাজানো অহেতুক প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তাদের অনুগত হওয়া ছাড়া আর আমাদের করার কিছুই নেই। সুতরাং, এ বাস্তবতাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াই হলো উত্তম। তাদের সকল খারাবির সাথেই (যদি কোন খারাবি থাকে) তাদের বড়ত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত। এ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ও পতাকাবাহীদের একীন হলো এই যে, পশ্চিমা বিশ্ব সবকিছুতেই আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। শুধু শিল্প ও টেকনোলোজি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতেই নয় বরং সভ্যতা সাংস্কৃতিতেও তারা আমাদের থেকে অনেক অগ্রসর। তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অভীষ্ট। তাদের কালচার ও সমাজব্যবস্থা, তাদের গবেষণাকেন্দ্র, তাদের রাজনীতি ও সাহিত্য, তাদের জীবন ব্যবস্থার প্রতি তারা এভাবে বিশ্বাস রাখে, যেভাবে তাদের উপায় উপকরণ, মেশিনারিজ, যন্ত্রপাতি, এবং থিউরিক্যাল সায়েন্স ও প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স এর উপর মানুষ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে। এ বিশ্বাসের কারণে তাদের অর্জন তো কিছুই হয়নি কিন্তু এর পিছনে তারা জীবনের সবকিছুই কোরবান করেছে। এর পিছনে তারা জীবনের বাস্তবশক্তির উৎস ও নিজের জিন্দেগীর পরিচালিকা শক্তি এবং সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তদুপরি, শিল্প ও টেকনোলোজির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি তাদের কাছে ধরা দেয়নি। তদুপরি তারা তাদের সকল ক্ষয়ক্ষতিকে মাথা পেতে বরণ করেছে। এখন তাদের কাছে না দ্বীন বাকি রয়েছে না এলেম, না উপায়-উপকরণ আর না জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। যদি তারা ইউরোপের কাছ থেকে কিছু পেয়ে থাকে তাহলে, তা হলো অন্ধ অনুকরণ, আত্মসমর্পণ,

আত্মভোলা, পূর্ণ মানসিক গোলামি এবং ইউরোপের নিয়ামত ভরা দস্তরখান থেকে পরিত্যক্ত কিছু খাদ্য, খাবার ও হাড্ডি। তারা ইউরোপের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত এ হাড্ডি পেয়ে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত।

তারা পশ্চিমা বিশ্বকে এমন সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে থাকে যেমন নাকি একজন ছোট বাচ্চা তার মক্তবের শিক্ষককে দেখে থাকে। অত্যন্ত ধৈর্য ও সহ্যের সাথে শিক্ষকের মারধোর বরদাশত করে থাকে। শিক্ষকের নির্দেশকে তারা অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করে থাকে। অত্যন্ত ধ্যান ও মেহনতের সাথে উস্তাদের দেওয়া সবক ইয়াদ করে থাকে। অতঃপর দিনরাত পরস্পর একে অপরের পাঠ শ্রবণ করে থাকে।

এটা এমন এক অবস্থান যেখানে পর্যালোচনা, রাহনুমাই এবং নিজের জ্ঞানতুষ্টির ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। এমন ক্ষেত্রে সহপাঠির সাথে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলা, বন্ধুর মত কোন বিষয় পর্যালোচনা করা, ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের লোকদের মত নিজের মতামত উপস্থাপন করা এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজস্ব সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করার কোন অনুমতি নেই। এ শ্রেণীর লোকদের মাঝে কোন মহান ব্যক্তিত্ব জন্ম না হওয়াতে হতবাক হওয়ার কিছুই নেই। যারা অনুকরণ থেকে বুলন্দ হয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মুখোমুখি বসে কোন বিষয়ে আলোচনা করবে এবং এলেম ও ফিকির, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইজ্জত-সম্মান, সাম্য ও সম্প্রীতি পারস্পরিক মূল্যবোধ ও মূল্যায়ন, আত্মমর্যাদাবোধ এবং নিজের দিল ও আখলাকের উপর বিশ্বাসী হয়ে পূর্ণ আস্থার সাথে তাদের চোখের উপর চোখ রেখে কথা বলতে সক্ষম এবং তাদের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণকারীদের পতাকাবাহী ও সমর্থকগণ প্রথম অবস্থা গ্রহণকারীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা পশ্চিমা বিশ্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জযবাতি ও হিংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। ফলে পশ্চিমা বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রয়েছে তাদের মাঝে অত্যন্ত ক্রোধ ও মনোবেদনা। আর এ কারণেই এর প্রতিকারে তারা রাজনৈতিক ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের সকল চেষ্টা ও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তারা তাদের দুশমনকে চিনতে প্রস্তুত নয়। তাদের শক্তির রহস্য এবং গোপন বিষয়াদি, তাদের ভালমন্দ, তাদের দুর্বলতাসমূহ এবং শক্তির উৎসসমূহ ভালভাবে বুঝতে আগ্রহী নয়। তারা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি এবং সামরিক অস্ত্রশস্ত্র থেকে উপকৃত হতে এবং এ সকল বস্তুকে সঠিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও

সঠিক কর্মকাণ্ডে, সঠিক আকিদা বিশ্বাস ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়। অথচ এরা ঐ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত।

তারা পশ্চিমা বিশ্বের মুক্তির স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে তাদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ রাখে। তারা তাদের ধ্বংসের তামান্না করে। পশ্চিমা বিশ্বকে ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে দ্রুত ধাবমান হতে দেখেও তাদের দিলে কোন ব্যথা অনুভূত হয় না। তারা শুধু এটাই দেখে যে, বিজয়ী ও ভাগ্যপ্রসন্ন পশ্চিমা বিশ্ব তাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে দখল করে রেখেছে। তাদের অর্থ-সম্পদ, জমিজমা কুক্ষিগত রয়ে গেছে। তারা একথা ভাবতে রাজি নয় যে, পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর আকিদা ও বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, তাদের ঈমান ও ইসলামী ঐতিহ্যবোধ দখল করে রেখেছে। তাদের দাওয়াত ও পয়গাম বা লেনদেন ও হিনমন্যতা যা সুদিকারবার থেকে মুক্ত এবং জাহেলী খেয়ালাত ও চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে সব সময় ও সর্বত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে তা পশ্চিমা বিশ্বের নগ্ন শিকারে পরিণত হয়েছে। বরং তা তাদের হিংস্র থাবায় রক্তাক্ত অথবা বিষাক্ত ছুরিতে নিহত হয়েছে।

এর পরিণতি হলো এই যে, পশ্চিমা বিশ্বের জন্য চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত রয়ে গেলো। ফলে পশ্চিমা বিশ্ব, নবপ্রজন্ম, শিক্ষিত যুবসমাজ ইউরোপে শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রদের, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মাঝে বিষাক্ত চিন্তা ও চেতনা প্রচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হলো। এ দীর্ঘ সময়ে এ দ্বিতীয় পক্ষ পশ্চিমা বিশ্বের এ ভয়ানক খতরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না। তাদের সামনে পশ্চিমা বিশ্বের স্নায়ু যুদ্ধ ও মানসিক দ্বন্দ্বের সঠিক রহস্য উৎঘাটিত হলো না। তারা এটাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না যে পশ্চিমা বিশ্বের বর্তমান নজর কোন দিকে। বর্তমানে তারা লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের রণকৌশলে কোন ধরনের অস্ত্র প্রস্তুত করছে এ ব্যাপারে তারা বেখবর রয়ে গেল। আর এসব কিছু দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে আশা করাও সম্ভব ছিল না। কারণ, তারা কখনও একজন স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী এবং সচেতন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি বা অনুভূতিশীল মানুষের মত পশ্চিমা বিশ্বের মুখোমুখি হয়নি এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার বিষয়ে চিন্তা ফিকির করেনি। তাদের দিলে পশ্চিমা বিশ্বকে কোমর সমান কাদা থেকে মুক্তির পথ নিয়ে চিন্তা করার তৌফিক হয়নি। ভিন্ন ভাষায় আমরা এভাবে বলতে পারি যে, প্রথম দল নিজেরা নিজেদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনার সমুদ্রে এবং পশ্চিমা বিশ্বের রাজনীতি ও সমাজনীতির উত্তাল উর্মিমালাতে

আত্মসমর্পণ করেছে। আর দ্বিতীয় দল এ ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত যে, তারা সাঁতার শেখা ছাড়া এবং সমুদ্রের গভীরতা ও প্রশস্ততা পরিমাপ করা ছাড়াই তা পাড়ি দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ দুটি সংঘাতময় রাস্তা ছাড়া ভিন্ন আরেকটি মধ্যম রাস্তা রয়ে গেছে। আর তা হলো একজন গাম্ভীর্যপূর্ণ বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির পথ। যিনি পশ্চিমা বিশ্বকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকারকারী নয় অথবা তিনি পশ্চিমা বিশ্বের সকল খারাবী ও ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করে না। বরং তিনি পশ্চিমা বিশ্বের আবিষ্কৃত জীবনকে সহজ করার এবং জীবনকে আরাম-আয়াশ দেওয়ার জন্য যে সকল উপায়-উপকরণ রয়েছে তার মাঝে এবং পশ্চিমা বিশ্বের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঘৃণিত কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নীতিভ্রষ্ট আখলাক, চরিত্র এবং সামাজিক রীতিনীতিকে একসাথে মিলজুল ও মিশ্রণ ঘটাতে প্রস্তুত নন। কারণ পশ্চিমাবিশ্বের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, ঘৃণিত কালচার, সভ্যতা ও সাংস্কৃতি, নীতিভ্রষ্ট আখলাক, চরিত্র এবং সামাজিক রীতিনীতি যা মানুষের উন্নত আদর্শ, পাক-পবিত্র জীবন পদ্ধতি ও ন্যায়নিষ্ঠাময় সমাজ ব্যবস্থার সাথে সংঘাতময়।

তৃতীয়পক্ষ অবলম্বনকারীগণ পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিটি জিনিসকে পরিপূর্ণ খারাপ অথবা পরিপূর্ণ ভালো মনে করে না এবং তার প্রতিবন্ধক হওয়ারও চেষ্টা করে না। তারা শুধু পশ্চিমা বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বেরই মোকাবেলা করে না বরং সর্বপ্রথম তারা বস্তুপূজার রূহ এবং আনানিয়ত ও আমিত্বভাব এবং উদরপূজা, মালের লিপ্সা, রাজত্বের মোহ পরিহার করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কারণ, এ সকল বস্তু আজ পশ্চিমা বিশ্বের শিরা-উপশিরায় রক্তের মত ধাবমান। এ তৃতীয় পক্ষ– 'ভাল যা তা আঁকড়ে ধর আর খারাপ যা তা পরিহার কর।' এ মূলনীতির ভিত্তিতে তারা পশ্চিমা বিশ্বের সচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন তথা ভাল ও কল্যাণকর বস্তুকে গ্রহণ করে। আর ক্লেদাক্ত ও নোংরা বস্তুকে পরিপূর্ণভাবে পরিহার করে। তারা পশ্চিমা বিশ্বের আবিষ্কৃত মেশিনারিজ এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত সকল প্রকার উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে উপকৃত হতে চায়। কারণ, এ সকল বস্তুর উপরে কোন জাতির একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষিত নেই। বরং এসব আবিষ্কৃত বস্তুসমূহ গোটা বিশ্বমানবতার এজমালি সম্পদ। এ তৃতীয়পক্ষ পশ্চিমা বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতি, কালচার ও সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে না। কারণ, এ সকল বস্তুত মানব জীবনের ছাঁচ তৈরি করে এবং আখলাক-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা সৃষ্টি করে।

এ তৃতীয়পক্ষ প্রাচ্যের মুসলিম দেশে অবস্থিত সাদা দিল মানুষদের মত এমন মনে করে না যে, পশ্চিমা বিশ্বের জাগতিক উন্নতি, অগ্রগতি এবং শিল্প-বিপ্লবের রহস্য এ নয় যে, সকল প্রকার বাধা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া এবং সকল প্রকারের নীতি-নৈতিকতাকে কুরবানি দেওয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে। বরং তাদের বিশ্বাস হলো এই যে, উন্নতি ও অগ্রগতির মূল রহস্য ও চাবিকাঠি হলো, স্থিতিশীলতা, সঠিক পরিকল্পনা পদ্ধতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি ও টেকনোলোজির ক্ষেত্রে তাদের অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান। আর এ সকল বস্তু জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য গঠন করার ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক রাখে না। ফলে তারা অত্যন্ত নৈতিক সাহসিকতা ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা দিয়ে থাকে এবং পশ্চিমা বিশ্বকে পরামর্শ দিয়ে থাকে যে, তাদের যেমন তাদের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের পূর্ণ হেফাজত করা উচিত, ঠিক তেমনি প্রাচ্যের মুসলিম বিশ্ব থেকে দ্বীন, আখলাক এবং দ্বীনি শিক্ষার আলো গ্রহণ করে সভ্যতা-সংস্কৃতি, উন্নতি ও অগ্রগতির সঠিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ একজন নারাজ প্রতিপক্ষ সমালোচক ও ভুল-ত্রুটি অনুসন্ধানকারীদের মত প্রতিটি কাজকর্মে ত্রুটি তালাশ করে না। আবার একজন আকুণ্ঠ অনুগত প্রিয় ছাত্রের মত অথবা একজন বাধ্যগত গোলামের মত তার সামনে অপমান ও গ্লানি মিশ্রিত অবস্থায় হীনমন্যতার সাথে আত্মসমর্পণ করে না। তারা পশ্চিমা বিশ্বের সকল কথাকে 'আমরা শুনলাম ও মানলাম' এ মূলনীতির ভিত্তিতে তাদের প্রতিটি কথাকে মাথা পেতে গ্রহণ করে না। বরং তারা পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিটি কাজকর্মকে অত্যন্ত শক্তি, সাহসিকতা ও পূর্ণ আস্থার সাথে পর্যালোচনা করে এবং তাদেরকে বলে থাকে যে, আপনাদের এ কার্যকলাপগুলো সঠিক এবং এ দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ভুল। সুতরাং পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যে সকল ক্ষেত্রে তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত, পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছ তার পরিণতি মঙ্গলকর। আর যে সকল ক্ষেত্রে তোমরা ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ তার পরিণতি অত্যন্ত নাজুক ও ভয়াবহ। তোমাদের যে সকল কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তগুলো উপায়-উপকরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও টেকনোলোজি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ক ছিল। এসব ক্ষেত্রে যদি কোন অলসতা বা ত্রুটি দেখা যায় এতে মানবতার বড় ধরনের ক্ষতি হবে না, কিন্তু এর বিপরীতে তোমরা যদি ভুল করে থাকো এবং সে ভুলের সম্পর্ক যদি তোমাদের শক্তি সামর্থ, উপায়-উপকরণগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণের

ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, মানুষ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, নবুওয়ত ও হেদায়াতের রাস্তা থেকে বিপথগামী হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, আখলাক-চরিত্র, উন্নত আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে এ ভুলের পরিণতি ও ক্ষতি প্রথম ভুল থেকে অনেক অনেক বেশি হবে।

এ নতুন গ্রন্থের মাঝে অত্যন্ত শক্তি ও পূর্ণ আস্থার সাথে এবং অত্যন্ত মার্জনীয় তথা মনোমুগ্ধকর বচনভঙ্গিতে এ নতুন অবস্থানের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে বুদ্ধিজীবী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে কথা বলার একটি অনুপম নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম দলের মত দুর্বলতা এবং ক্ষমাপ্রার্থনা এবং পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আগত প্রতিটি জিনিসের প্রতি মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবন পদ্ধতির প্রতি প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়নি অথবা এ গ্রন্থের মাঝে পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করার মানসিকতা লুক্কায়িত নেই। যা প্রাচ্যের মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক লিডারদের চিন্তা-চেতনার মাঝে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মূলতঃ এ দৃষ্টিভঙ্গি একবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দির শুরু লগ্নে পরিলক্ষিত হয়েছিল। আর উভয় দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ব ও পশ্চিমের আমজনতার জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি এবং মুসলমানের উপর যে বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল এবং তাদের যে মূল মিশন ছিল সে মিশনের দাওয়াতও পূর্ণতা লাভ করেনি।

এ গ্রন্থকার একজন আদর্শ ইসলামী দাঈ বা ইসলাম প্রচারকের চিত্র তুলে ধরেন এবং ইসলাম প্রচারকের সামনে পশ্চিমা বিশ্বকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ছাড়া কোন ওজর পেশ করা লজ্জার কারণ বলে চিহ্নিত করেন। ফলে তিনি এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া পছন্দ করেননি। তিনি পশ্চিমা বিশ্বকে সুস্পষ্ট ভাষায় দাওয়াত দিয়ে থাকেন যে, পশ্চিমা বিশ্ব গোটা বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে এবং তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতি ও জীবনের গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম এবং বিশ্ব মানবতাকে একথা তারাই বলতে পারে যে, "এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উপায়-উপকরণ সার্বজনীন তথা গোটা বিশ্বমানবতার জন্য। এর মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের মূল শান্তি, সমৃদ্ধি ও সফলতা এবং কামিয়াবি অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, উপায়-উপকরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও টেকনোলোজি

যদি ঈমান ও সঠিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথে ব্যবহার হয়ে থাকে। তারা পশ্চিমা বিশ্বকে শুধু এতটুকু দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত হন না বরং তারা ইউরোপের জনগোষ্ঠীকে তাদের আত্ম-অহমিকা, অহংকার, হঠধর্মী এবং জ্ঞানের অহংকারের দিকেও দৃষ্টি দিতে বলেন। কারণ, এ সকল বস্তু সঠিক পথের জন্য প্রতিবন্ধক। এসব প্রতিবন্ধকতার কারণে আলোর ফোয়ারা তার উপর বর্ষিত হয় না। আর এসব কিছুই বলা হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা, ঈমানী হেকমত, এখলাস ও দরদভরা অন্তর দিয়ে এবং অত্যন্ত সমবেদনা ও অস্থিরতার সাথে। তিনি ইউরোপে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষানবিশ যুবসমাজের সাথে বিশেষ আবেদন করেছেন যে, এ যুবসমাজ যেন পশ্চিমা বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতির ধোঁকায় না পড়ে। কারণ এর বাহ্যিক দৃশ্য অত্যন্ত শোভামণ্ডিত চকচকে, চিত্তাকর্ষক কিন্তু তার ভিতর অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধময়। তারা যেন ইউরোপে একজন ধর্ম প্রচারক ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে জীবন-যাপন করে। তারা যেন ইউরোপে এসে একজন আকুণ্ঠ অনুগত সাগরেদের মত অন্ধ অনুকরণ না করে। বরং তারা প্রাচ্যে ও পশ্চিমের মাঝে একটি নতুন সেতু বন্ধনে পরিণত হয় বরং ভিন্ন ভাষায় তারা যেন নতুন 'সুয়েজখাল' খনন করতে সক্ষম হয়। যা পূর্ব ও পশ্চিমে উভয়ের স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আর এভাবে তারা যেন নিজেদের দেশে ফিরে আসেন যে, ইসলাম এক চিরন্তন ধর্ম এ সম্পর্কে তাদের দিলে আগের তুলনায় অনেক বেশি আস্থা সৃষ্টি হয় এবং তাদের ঈমান ও আস্থা যেন কখনই কম্পিত ও সন্দেহযুক্ত না হয়। তাদের দিলে যেন পশ্চিম' বিশ্বের ব্যাপারে এবং গোটা মজলুম ইনসানিয়াতের ব্যাপারে আগে থেকে অধিক দরদ ও ব্যথা পয়দা হয়। কারণ, বর্তমান পশ্চিমা বিশ্ব ও তামাম বিশ্বমানবতা ধ্বংস ও বরবাদির অগ্নিগর্ভের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

এ বিষয়টি লক্ষ্য করে এ কিতাবের মাঝে 'দুটি' সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়। অর্থাৎ, প্রথমতঃ পশ্চিমা বিশ্বকে জাহিলিয়াতের দিকে চলমান অগ্রযাত্রা বন্ধ করে ইসলামের দিকে ফিরে আসার প্রতি দরদভরা দাওয়াত এবং দ্বিতীয়ত ইউরোপে অধ্যয়নরত মুসলিম নওজোয়ানদেরকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তথা ইসলাম প্রচারক ও ইসলামী নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রতি উদাত্ত আহ্বান। এ গ্রন্থে এমন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে, যা পশ্চিমা বিশ্বের একজন মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত এবং যা পশ্চিমা বিশ্বের বিষাক্ত থাবা ও তার নগ্ন হামলা থেকে আত্মরক্ষা করার ঢাল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং একজন মুসলমান যেন উজ্জ্বল দীপ্ত সূর্যের ন্যায়

এবং কাঙ্ক্ষিত কর্মতৎপরতা পরিচালনা করার মত নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারে। পরিশেষে সে যেন আল্লাহ্ তায়ালার গায়েবী নুসরাত ও তৌফিক লাভে ধন্য হয়ে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়।

মূলতঃ এ গ্রন্থটি আরবিতে রচনা করা হয়েছিল। মাওলানা সালমান শামসী নদভী— যার তরজমা ও লেখালেখির অভ্যাস রয়েছে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে এ কিতাবের উর্দুতে অনূদিত বিষয়বস্তুগুলোকে সংকলন করেন। বর্তমানে এ কিতাবটি 'মসজলিসে তাহকিকাতে' ও 'নাসিয়াতে ইসলাম' এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালা এ গ্রন্থটিকে সর্বজন সমাদৃত করুন এবং একে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব এবং ইসলামের সৌন্দর্যের দিল আকর্ষক চিত্র হিসেবে পশ্চিমা প্রিয়দের দিল ও দেমাগে এক নতুন রেখা সৃষ্টি করে। আর আল্লাহর পক্ষে তা করা কঠিন কিছু নয়।

এমন এক মূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকা লেখার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ, লেখাটি কিতাবের খেদমত ও পরিচিতি থেকেও আমার জন্য অত্যন্ত বরকতের কারণ।

মুহাম্মদ আল হাসানী
১১,১২,১৯৭২ ইং
৪-এ জিলকদ, ১৩৯২ হিজরী
৩৭ নং গোয়েন রোড, লাক্ষ্ণৌ।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূর্ব ও পশ্চিমের নামে মানবতার পয়গাম	২৫
পূর্ব পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব	২৫
এ দূরত্বের মূল কারণ	২৬
এ দূরত্বের কতিপয় ক্ষতিকর দিক	২৭
জাতিগত জাতীয়তাবাদ	২৮
প্রাচ্যবিদদের আন্দোলন	২৯
প্রাচ্যের বিশেষত্ব	৩০
নবুওয়তের কারনামা	৩১
মানবতার নতুন ভাবনা	৩১
নবীদের (আঃ) দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতি	৩৩
শুধুমাত্র উপায়-উপকরণ যথেষ্ট নয়	৩৫
ইউরোপের নব রেনেসাঁ	৩৬
ইউরোপের জাগতিক সমৃদ্ধি	৩৭
উপকরণের ব্যর্থতা	৩৮
ভুল কোথায়?	৩৯
বর্তমানে মানবতার দেমাগ জীবিত কিন্তু দিল মৃত।	৩৯
মানবতার তালা একমাত্র ঈমানের চাবি দ্বারাই খোলা সম্ভব	৪০
মৌলিক খারাবির কারণ	৪০
প্রাচ্যের উপহার	৪১
জার্মান জাতির নামে খোলা চিঠি	৪২
জার্মান জাতির বৈশিষ্ট্য ও সৎসাহস	৪৩
জার্মান জাতির দুর্ভাগ্য	৪৪
বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ	৪৪
জার্মান জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৪
জার্মানের ভুল	৪৬
ইউরোপ গমনকারী ছাত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৬
পশ্চিমাদের জীবন দর্শন	৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধর্ম বিমুখতার পরিণতি	৮৬
ইউরোপের জ্ঞান ভাণ্ডার ইউরোপের জন্য ধ্বংসের কারণ	৮৭
মুক্তির পথ	৮৮
হেদায়তের ঝর্নাধারা	৯০
শুধুমাত্র অহংকারই প্রতিবন্ধক	৯০
এশিয়ার দেশগুলোর পরিণতি	৯১
আসল রোগ	৯২
চিকিৎসা শুধু একটাই	৯২
নবুওয়তী শক্তি	৯৩
এশিয়ার দেশগুলোর সৌভাগ্য	৯৩
প্রয়োজন শুধু উদারতার	৯৪
আল কুরআনের উদাত্ত আহ্বান	৯৪
মজলুম মানবতা	৯৫
চক্ষুশূল	৯৫
কাঁটাবিদ্ধ মানবতা	৯৫
মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা	৯৭
লোভ-লালসা	৯৭
দুর্নীতির মূল কারণ	৯৮
অশান্তির মূল কারণ	৯৯
জীবনের শান্তি	৯৯
মানবজীবনের সংকট ও তার কারণ	১০০
স্বার্থ পূজারী	১০১
স্বার্থের পরিণতি	১০২
সমাজের গোপন রোগ	১০৩
প্রাচুর্যতা ও উন্নতির চাবি	১০৪
রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিন্তু সাংস্কৃতিক গোলামী	১০৭
পূর্ব-পশ্চিমের পরিচয়	১০৭
ভারতবর্ষ	১০৭
মিশর	১০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
তুরস্ক	১০৮
ভৌগোলিক স্বাধীনতা কিন্তু সাংস্কৃতিক গোলামী	১০৯
আমরা ধর্মীয় গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রাশ্চাত্যের ভিখারী	১১০
ফাসেদ নেতৃত্ব	১১১
ঈমানের শক্তি	১১২
মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ	১১২
দিলের ভাষা	১১৩
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণের মাঝে পার্থক্য	১১৫
সনাতনবাদ ও আধুনিকতা	১১৫
দেহ প্রাচ্যের আর দিল-দেমাগ পাশ্চাত্যের	১১৫
আপনারা মুসলিম উম্মাহর সদস্য যারা দিয়েছিল বিশ্ব মানবতাকে মুক্তি	১১৬
মৌলিক বাস্তবতা	১১৭
যদি আমরা ইউরোপ থেকে কিছু নিতে পারি তাহলে তাকে উত্তম কিছু দিতেও সক্ষম	১১৯
দুনিয়ার সফলতা ও বরবাদী মানুষের সাথে সম্পৃক্ত	১২১
বিশ্বব্যাপী বরবাদী	১২১
দুনিয়ার সফলতা ও বরবাদী মানুষের সাথে সম্পৃক্ত	১২২
নবীগণ (আঃ) সকল শক্তি ব্যয় করেছেন মানুষের পরিশুদ্ধির জন্য	১২৩
স্বয়ং মানুষ একটি জগৎ	১২৩
মানুষই ইসলাহ ও পরিবর্তনের কেন্দ্র	১২৫
মানুষের মাঝে অজস্র হিংস্রতা রয়েছে যদি তা প্রকাশ পায় তাহলে দুনিয়া বরবাদ হয়ে যাবে	১২৬
বাহ্যিক হিংস্র প্রাণী কখনো দুনিয়াকে আক্রমণ করেনি	১২৭
এক দেশের হিংস্র প্রাণী কখনো অন্য দেশের হিংস্র প্রাণীর উপর আক্রমণ করেনি	১২৭
মানুষের ভিতরে হিংস্রতা কখন বাইরে আসে?	১২৭
সকল খারাবির উৎস মানুষের দিল	১২৯
সকল পরিণতির উৎস মানুষের দিল	১৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
যদি দুনিয়াকে জান্নাত সাদৃশ বানানো হয় আর দিল যদি খারাপ হয় তাহলে দুনিয়া জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডতে পরিণত হয়	১৩০
দিলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন	১৩১
যখন দিলের দুনিয়া বদলে যায়	১৩২
ইরাদা যদি নেক হয় তাহলে বন্ধুর পথ হয় ফুলেল	১৩৩
এখন সব কিছুই রয়েছে নেই শুধু দরদ ভরা অন্তর	১৩৪
মানুষ সব কিছু করতে পারে কিন্তু করার ইচ্ছা নেই	১৩৫
গলদ রুখই হলো খারাবির উৎস	১৩৬
মানুষের সকল সম্পদ আজ রোগাক্রান্ত	১৩৭
আজ মানুষ নিলামে বিক্রয় হচ্ছে	১৩৮
ফ্যাসাদ ও বিগাড়ের মূল ধর্ম নয়	১৩৮
গোটা লড়াই স্বার্থপরায়ণতার	১৩৯
মুক্তির একটি মাত্রই পথ	১৪০
আমাদের চিকিৎসা আমাদের কাছেই	১৪১
ঈমানের রশ্মিই হলো দুনিয়ার একমাত্র চিকিৎসা	১৪২
দেমাগের ভাষা অসংখ্য কিন্তু দিলের ভাষা একটি মাত্র	১৪৩

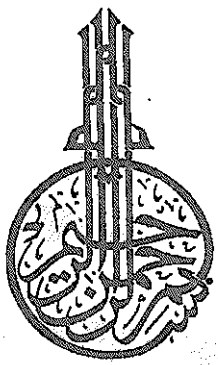

(এ বক্তৃতাটি ১৯৬৩ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে করা হয়েছিল)

পূর্ব ও পশ্চিমের নামে মানবতার পয়গাম

পূর্ব পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব ঃ

বিশিষ্ট এক ইংরেজ কবি কিপলিং (KIPLING) এক সময় বলেছিল, প্রাচ্য প্রাচ্যই থেকে যাবে আর পশ্চিমা বিশ্ব পশ্চিমাই রয়ে যাবে। উভয়ের কখনই সমন্বয় হবে না। এ উক্তি যদিও বা এ শতাব্দীতে হারিয়ে যাওয়া একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের, তথাপি বলতে হয়, এটি মূলত পশ্চিমাদের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, কখনও এমন হয়, কোন সমাজে কখনো কোন বিশেষ ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতাকে আত্মস্থ করে নেয়। অতঃপর উক্ত ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা সমাজের সদস্যদের আকিদা-বিশ্বাস, অনুভূতি ও উপলব্ধি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর কবি বা সাহিত্যিকগণ যেহেতু সমাজের মুখপাত্র তাই তারা তা অত্যন্ত মনমুগ্ধ ও আকর্ষণীয়ভাবে সমাজকে উপহার দেয় এবং তা উপমা হিসেবে মানুষের মুখে মুখে চলতে থাকে। পরবর্তীতে তা সকল নবপ্রজন্মের মাঝে চলতে থাকে এবং এটাকে একটি মূলনীতি হিসেবে আত্মস্থ করে নেয়।

কিন্তু এ বিষাক্ত ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা মানবতাকে এমন ক্ষতি করেছে এবং মানবভ্রাতৃত্ববোধের মূলনীতিকে এভাবে তছনছ করেছে এবং মানুষের চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতিকে এভাবে ধুলোয় ধূসরিত করেছে আমি ভেবে পাই না যে, এছাড়া অন্য কোন মতাদর্শ মানবতাকে এত বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এ ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শ বিশ্বমানব পরিবারকে পূর্ব ও পশ্চিম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দু'টি শাখাতে বিভক্ত করেছে। বলতে তো এটি একটি সহজ সরল কথা বা একটি ঐতিহাসিক স্বীকৃত বিষয় কিন্তু এ মতাদর্শের কারণে মানুষ পূর্ব ও পশ্চিম দু'টি মুখোমুখি শিবিরে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। কারণ, তাদের ধারণা দুটি শিবির কখনই একত্রে মিলিত হতে সক্ষম নয়। আর যদি মিলিত হয় তবে তা যুদ্ধের ময়দানে, এ ছাড়া কোথাও যদি কোনক্রমে মিলিত হয়। তবে পরস্পরের কুৎসা রটনা করবে এবং খুঁজে খুঁজে অন্যের দোষ বর্ণনা করে নিজের অন্তরদহ প্রশমন করবে।

শত শত বছর ধরে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে এমনই চলে আসছে। উভয়েই কেউ কাউকে বুঝার চেষ্টা করেনি। আর যদি বুঝার চেষ্টা করেও থাকে তাহলেও হাল্কাভাবে এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে, যা ছিল উভয়ের দুর্বল দিক। আর তাদের ভালোদিক, শক্তি ও জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে অধিকাংশই বেখেয়াল রয়ে গেছে। ফলে যখনই পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই পরস্পরকে সন্দেহ, ভয় ও খারাপ দৃষ্টিতে দেখেছে বা ঘৃণা ও নারাজীর দৃষ্টিতে দেখেছে।

এ দূরত্বের মূল কারণ ঃ

সর্বপ্রথম পূর্ব ও পশ্চিমের সাক্ষাৎ ঘটে ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে। ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে আক্বীদা-বিশ্বাস প্রাচ্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদেরকে হামলা করতে উৎসাহিত করেছিল এবং যে প্রাণশক্তি তাদের মাঝে কর্মতৎপর ছিল এবং তাদেরকে পাগল ও উত্তেজিত করত তার ভিত্তি ছিল ঐ সব কাহিনী যা তারা মুসলমানদের ব্যাপারে শ্রবণ করেছিল এবং সেগুলোকে তারা সঠিক মনে করত, অন্যদিকে তাদেরকে বলা হত যে এ ক্রুসেডের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকাকে হিংস্র, বর্বর মূর্তি পূজারীদের নাপাক হাত থেকে মুক্ত করা।" এ ছাড়া কখনই যুদ্ধের দাবানল ও ভয়ানক পরিস্থিতি কোন যুদ্ধের নেশায় মত্ত কোন সৈনিককে এ সুযোগ দেয় না যে, সে অপর পক্ষের ভাল দিকগুলো খুবই খেয়াল করে দেখবে। তাদের যোগ্যতাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। অতঃপর তাদের আকিদা-বিশ্বাসকে স্টাডি করে তার মূল্যায়ন করবে এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবে এবং সাম্য-সম্প্রীতির

মূল নীতির ভিত্তিতে পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলো বিবেচনা করার রাস্তা প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করবে। কিন্তু সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, ক্রুসেডযুদ্ধ এরপরেও উপকার থেকে খালি ছিল না। এর মাধ্যমে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব শেষ না হলেও সংকুচিত অবশ্যই হয়েছে।

পূর্ব ও পশ্চিমের পারস্পরিক পরিচয় খুব কাছ থেকে ঐ সময় হয়েছিল। যখন পশ্চিমা বিশ্ব তাদের লৌহ হস্তকে বিংশ শতাব্দীতে রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে প্রাচ্যের দিকে সম্প্রসারিত করেছিল এবং একের উপর এক প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। সাথে সাথে তারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাইন্স ও টেকনোলোজি দিয়ে প্রাচ্যের উপর শক্ত আঘাত হেনেছিল। তারা তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতির ভাল-মন্দ উভয় দিক দিয়ে প্রাচ্যকে পরাধীন করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ, প্রাচ্য সে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও যুদ্ধনীতিতে পশ্চাতপদ অবস্থায় ছিল। প্রাচ্যের উপর ধ্বংসাত্মক আক্রমণের কারণে তারা প্রাচ্যের গভীরে প্রবেশ করে তাদেরকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা এবং নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। বরং আমাকে মাফ করা হলে আমি বলতে বাধ্য যে, এ ক্ষেত্রে তাদের বাধার মূল কারণ ছিল, তখন পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতি যৌবনের ষোলকলায় পূর্ণ ছিল এবং তার মাঝে ঐ সকল বিষয় ছিল যা একটি সভ্যতা সংস্কৃতির মাঝে বিদ্যমান থাকে। আর তখনই তার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দুর্বল হয়ে যায়। মাফ করবেন–আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যা প্রাচ্যকে বুঝার ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তা হল, পশ্চিমা বিশ্বের শাসকগোষ্ঠীর আত্ম অহমিকাবোধ, অহংকার, ক্ষমতার নেশা এবং নিজেদেরকে জন্মগতভাবে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রবণতা এবং যাদের হাতে কাল পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা ছিল তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা প্রাচ্যকে না বোঝার জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে ঐসব কারণে প্রাচ্যের অধিবাসীদের অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠীর ঐসব আচরণ পশ্চিমা বিশ্বের মানবাধিকার ও তাদের গণতন্ত্রের সাথে অমিলও ছিল।

এ দূরত্বের কতিপয় ক্ষতিকর দিক ঃ

এ কারণে দুর্বল প্রাচ্যের অধিবাসীদের মাঝে বিজয়ী ও শক্তিশালী পশ্চিমা বিশ্বের সামনে আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা দেখা দিল। পশ্চিমাদের

চিন্তা-চেতনাকে সীমাহীন গুরুত্ব দিতে লাগল। তাদের বাহ্যিক সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা এবং তার সন্ধানুকরণ করার প্রবল আগ্রহ জন্মেছিল, যা প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের অন্ধভক্ত বানিয়ে দিয়েছিল। ফলে প্রাচ্যের অধিবাসীরা পাশ্চাত্যকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ ও মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে লাগল এবং পরাজিত হওয়াকে জীবনের নিয়তি মনে করে কাফেলার পিছে থাকাকে গনিমত মনে করতে লাগল। তাদেরকে মহত্ত্ব ও মূল্যায়নের দৃষ্টিতে দেখা তো অনেক দূরের কথা বা তাদের থেকে কোন বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে পথিকৃৎ ভাবা তো অনেক দূরের কথা পশ্চিমাদের অনুকরণ করাকেই সৌভাগ্য মনে করতে লাগল। প্রাচ্যের এ হীনমন্যতার কারণে তাদের সাম্য ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার মানসিকতাকে পশ্চিমা বিশ্ব হারিয়ে ফেলল। অন্যদিকে প্রাচ্য নিজের অস্তিত্ব পাশ্চাত্যের মাঝে বিলীন করার উপক্রম ছিল।

জাতিগত জাতীয়তাবাদ ঃ

এরপর প্রাচ্যের উপর জাতিগত জাতীয়তাবাদের মতবাদ আঘাত হানে। মূলত এ মতাদর্শকে পশ্চিমা বিশ্ব একটি সাময়িক সমাধান হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কারণ, এর মাধ্যমে তারা তাদের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি করত। পরবর্তীতে পশ্চিমা বিশ্ব নিজেই এর খারাবী ও অকল্যাণকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং তাকে আল-বিদা জানাতে বাধ্য হয়। মোট কথা এ জাতিগত জাতীয়তাবাদের কারণে প্রাচ্যের অধিবাসীদের কাছে আসমানী পয়গাম ও বিশ্ববাসীর জন্য দাওয়াতের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সুযোগ ছিল না যে, তারা পুনরায় পশ্চিমা বিশ্বের দিকে সাহায্য ও বন্ধুত্বের হাত বাড়বে। আবার মানবতার সাহায্যের জন্য সেভাবে অগ্রসর হবে যেভাবে তারা অতীতে সকল বিপদের সময় অগ্রসর হত। তারা আবার মানবতাকে এক নবজীবনের চেতনা দিবে এবং সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিময় জীবনের নতুন ভিত্তি রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাচ্যের মুসলিম জাতি ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত সমস্যা এবং জাতীয় সংকটের জালে জড়িয়ে পড়ল। তারা নিজেদেরকে জাতিগত, ভাষাগত ও মানচিত্রগত সংকীর্ণ সীমানার মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলল। আর এভাবেই জীবন চালিকা শক্তি পূর্ণ ও পরিষ্কার ও স্বচ্ছ, পুরাতন ও প্রবাহিত ঝর্নাধারা তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল। যা মূলতঃ বিশ্ববাসীর জন্য ছিল আলোর চূড়া আর ইতিহাস স্বীকৃত যে, তা ছিল সর্বযুগে হিদায়াতের মূল উৎস।

প্রাচ্যবিদদের আন্দোলন ঃ

এরপর পশ্চিমা বিশ্বে প্রাচ্যবিদ ও প্রাচ্যবিদ্যার যুগ শুরু হয়। তাদের কর্ম তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছিল যে, এসব মনীষীগণ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ন্যায়সঙ্গত একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। তারা পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে বিরাট সাগরকে পাড়ি দিতে সক্ষম হবে যা মানবতার দু'খান্দানের মাঝে প্রবাহিত। তারা উভয়ের মাঝে অজ্ঞতা ও দূরত্বের করণে সৃষ্ট মনোমালিন্যকে দূর করতে সক্ষম হবে। তারা প্রাচ্যের উত্তম ঐতিহ্য ও জ্ঞান ভাণ্ডার, নবীদের পয়গাম ও মৌলিক আদর্শ, ধর্মীয় ব্যক্তিদের উত্তম সীরাত, প্রাচ্যের গৌরবময় ঐতিহ্য, তাদের উত্তম আদর্শ ও সফল জীবন বিধানকে অনুবাদ করে পশ্চিমা বিশ্বকে উপহার দিবে। নিঃসন্দেহে তারা এ ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছে। শত বছরের পুরাতন আলোরমুখ না দেখা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে তা জীবিত করার ব্যবস্থা করেছে। সেগুলো বিশুদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ মেহনত করেছে, মূল উৎসের সাথে মিলিয়ে ছাপার ব্যবস্থা করেছে। এ ছাড়াও তারা এমন মৌলিক ইসলামী গ্রন্থাদি রচনা করেছে যার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বরং যার মাঝে ন্যূনতম ইনসাফ আছে এবং এলমী রূহ, জ্ঞানের আগ্রহ আছে তাদের এ কৃতীকে অবমূল্যায়ন করতে পারে না। এক্ষেত্রে তারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তারা তাদের সাধনাতে যে ভাবে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত ছিল এবং তাদের বিজ্ঞ আলেমদের পদ্ধতি ও দূরদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও গভীরতা রয়েছে তার কোনটাকেই ভোলার নয়।

কিন্তু এ সত্ত্বেও বাস্তব সত্য হল মুসলমানদের অনুভূতি হল, এ সকল প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশের কাছেই জ্ঞান-গবেষণার পরিবর্তে ধর্মীয় অনুভূতিই প্রাধান্য ছিল। আর এজন্য এলেম প্রিয় ও সত্য সন্ধানী শ্রেণী এ অপেক্ষায় ছিল যে, এসব ব্যক্তিবৃন্দ বিগত শতাব্দীর তিক্ততা থেকে নিজেদেরকে নিরপেক্ষ রাখতে সক্ষম হবে এবং তাদের মাঝে বাস্তবতাপ্রিয়, সত্য সন্ধানের আগ্রহ এবং তা স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সৎসাহসের পরিচয় দিবে। মোট কথা বাস্তবতা হল প্রাচ্যবিদদের অসংখ্য ভাল গুণ ও অতুলনীয় খেদমত থাকা সত্ত্বেও তারা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব দূর করতে সক্ষম হয়নি এবং তারা পশ্চিমা বিশ্বে গবেষকদের সংখ্যা কম না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রাচ্যের দেশগুলোতে আত্মবিকাশ লাভ করার সকল ধর্মীয় আন্দোলন বিশেষতঃ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও মনপুতঃ ধারণা দিতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের আক্বিদা বিশ্বাস হল, ইসলাম হল সর্বশেষ আসমানী ধর্ম যা চিরন্তন ও সর্বজনীন। এ ধর্মের মাঝে রয়েছে সকল নবুওতী শিক্ষা এবং আসমানী হেদায়েত। আর এসবকিছুই রয়েছে সর্বশেষ মডেল ও অত্যাধুনিক আকৃতিতে, যা সর্বকালের

উপযোগী। ইসলাম কোন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পিছনের দিকে ঠেলে দেবার পক্ষে নয়, যা অন্যান্য ধর্ম করে থাকে। বরং সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অগ্রসর ও অগ্রগতি সাধনের প্রবক্তা। বস্তুত ইসলামের ইচ্ছাই হল উগ্রবাদ, স্থূলতা ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে একটি স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন রূপ দান করা যা শক্তি-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন সমাজের জরুরত পুরা করতে সক্ষম হবে।

মুদ্দাকথা, কারণ যাই হোক না কেন পূর্ব ও পশ্চিম স্ব-স্ব পয়গাম ও স্বকীয়তা নিয়ে পৃথক পৃথক রয়ে গেছে। যদি কখনও পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়ে থাকে তাহলে হিংসা-বিদ্বেষ, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের তুফানের মাঝে হয়েছে। কখনও উভয়ে মিলে মানবতার কল্যাণে কাজ করা বা একটি আদর্শ সভ্যতার জন্ম দেবার লক্ষ্যে একত্র হবার সৌভাগ্য হয়নি। তারা উভয়ে মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আল্লাহ্প্রদত্ত সুপ্ত প্রতিভা, জন্মগত যোগ্যতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকভাবে যে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন হয়েছে তা নিয়ে মতবিনিময় করতে খুব কমই রাজী হয়েছে। আর হলেও খুবই সীমিত পরিসরে হয়েছে।

প্রাচ্যের বিশেষত্ব ঃ

প্রাচ্য নিজেদের ক্ষমতার পরিসরে কাজ করেছে। তাদের মৌলিক উপাদান ধর্মের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মহান আম্বিয়া (আঃ) তাদেরকে সর্বদা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছে এবং দ্বীনি দাওয়াত ও রূহানী ব্যক্তিত্ব সর্বদা তাদের আধ্যাত্মিক খাদ্যের জোগান দিয়েছে। কারণ, সে সব মহামনীষীদের মহান ব্রতী ছিল মানুষের পাশে থেকে মানুষ গড়ার সাধনা। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েছিল। তারা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দৃঢ় সংকল্পকে এজন্য কুরবানী দিয়েছে। তাদের সর্বাত্মক সাধনা ছিল যে, মানুষ অতল গহ্বরের সন্ধান লাভ করবে এবং অত্যন্ত গোপন রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবে এবং তার মাঝে থাকা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে এবং তার মাঝে লুকিয়ে থাকা শক্তিকে জাগ্রত করবে যার মোকাবেলা অন্য কোন শক্তি করতে সক্ষম হয়নি। তার ধ্যান-খেয়াল ও চিন্তা-চেতনা এবং সৎসাহসকে একমুখী করবে এবং তার আখলাক-চরিত্র ও চাল-চলনকে সুন্দর করবে। কারণ এ ছাড়া মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না।

নবুওয়তের কারনামা ঃ

আম্বিয়া (আঃ) এবং বিশেষ করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ মিশন ছিল মানুষের তরবিয়ত করা।

তাঁরা মানুষের সুপ্ত প্রতিভা ও গোপন শক্তির উৎসকে উজ্জীবিত করে মানুষের গোপন ও লুক্কায়িত যোগ্যতাকে জাগ্রত করে, তাদের অন্তর চক্ষু খুলে দিয়ে তাদের স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের মালিককে তাদের দেখাতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তারা এর মাধ্যমে আলো ও উত্তাপ, প্রাণের উষ্ণতা ও মুহাব্বত, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প, আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা বিশ্বজগতের মাঝে জীবনের উৎস, শক্তির মূলমন্ত্র সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হয়েছে। তারা এমন এক কেন্দ্রবিন্দুর সন্ধান লাভ করেছে যার মাধ্যমে তারা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য পদার্থ ও উপাদানকে এক সুতোয় গাঁথতে সক্ষম হয়েছে। ফলে দুনিয়া তার জন্য যেন এক ইউনিটে পরিণত হয়েছে, যেখানে কোন বিশৃঙ্খলা নেই, নেই কোন ভিন্নতা, অথবা দুনিয়ার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্ত শাসিত ও লাগামহীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে থাকার সম্ভাবনা নেই, যার আশে-পাশে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। বরং আম্বিয়াদের মেহনতের ফলে এ বিশ্বজগত এক বিশাল বিস্তৃত রাষ্ট্রে পরিণত হয় যার পরিচালনা করছে এক শক্তিশালী ও রহমদিল দয়ালু প্রতিষ্ঠান। যার কাছে পূর্ব ও পশ্চিমের কোন তফাৎ নেই।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ـ

তিনি পূর্ব পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ ও মাবুদ নেই। সুতরাং তাকেই তোমরা উকিল ও কর্মবিধায়ক হিসেবে গ্রহণ কর। (মুযাম্মেল ঃ ৯)

মানবতার নতুন ভাবনা ঃ

আম্বিয়াদের তালীম ও তরবিয়তের কারণে মানুষ মূর্তিপূজা, দৈত্যপূজা, অলিক কল্পনা কাহিনী বা সনাতন ও সামাজিক রসম-রেওয়াজের অন্ধানুকরণের বন্ধন মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছে। আর এভাবে সে বিশ্বজগতের পরিচালক ও স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করার অপমান থেকে নাজাত পেয়ে ধন্য হয়। যদিওবা সেসব বস্তু কল্যাণকর বা ক্ষতিকর হোক না কেন, পাথর বা বৃক্ষ, নদী বা সমুদ্র, সূর্য বা চন্দ্র, ফেরেশতা বা মানুষ, পুরুষ বা মহিলা যেই হোক না কেন।

নবীগণ যখন মানুষের অন্তরচক্ষু খুলে দেয় আর মানুষ যখন সে অন্তর চক্ষু দ্বারা নিজের ব্যক্তিস্বত্ত্বা ও অন্যান্য মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তখন সে

নিজেকে এ বিশ্বজগতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দেখতে পায়। যার মাঝে আল্লাহ্ তায়ালা নিজের বিশেষ রূহ প্রদান করেন এবং তাকে নিজের আমানতদার হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং তাকে গোপন রহস্য দান করেন। নবীগণের শিক্ষার ফলে সে দেখতে পায় যে, তাকে সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সম্মানিত করেছেন, দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও পরিচালনা ভার দান করেছেন, রাজত্ব ও খেলাফতের মুকুট তার জন্য শোভামণ্ডিত করেছেন এবং দুনিয়ার সকল বস্তু তার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র নিজের জন্য। বিধায় তার সামনে ফেরেশতাদেরকে সিজদা অবনত করিয়েছেন। এভাবে তার জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন অন্যের সামনে সিজদা অবনত হতে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

অর্থ ঃ আমি মানুষকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। (ত্বীন ঃ ৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

ولقد كرم بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات - وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا -

অর্থ ঃ আমি বনি আদমকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে জলযান ও স্থলযানে আরোহণ করিয়েছি এবং তাদেরকে পাক পবিত্র রিযিক প্রদান করেছি এবং তাদেরকে আমার সৃষ্ট অনেক মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

অতঃপর মানুষ যখন নবুওয়তের প্রদত্ত অন্তর চক্ষু দ্বারা স্বজাতি মানুষ এবং ঐসব মানব পরিবারকে দেখে যারা পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোতে বসবাস করছে তখন তাদেরকে এক মানবগোষ্ঠী বলেই মনে হয় এবং তাদের আকৃতি একই রকম। তারা এক মাতাপিতার সন্তান। নবীগণের শিক্ষার আলোতে বনী আদমকে আল্লাহর পরিবার বলে মনে হল এবং এ কথার বিশ্বাস সৃষ্টি হল যে, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হল সে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের জন্য কল্যাণকর। নবীদের শিক্ষার ফলে তাদের মাঝে এ উপলব্ধি সৃষ্টি হল যে, তাদের মাঝে যেমন মানবীয় প্রাণ ও অনুভূতি আছে ঠিক তেমনি সারা দুনিয়াতে বিস্তৃত বনী আদমের মাঝে মানবীয় প্রাণ ও অনুভূতি আছে। তাদের যেমন কোন বিপদে পীড়া ও যন্ত্রণাবোধ হয় তেমনি অন্য সকল বনী আদমের বিপদ মছিবতে পীড়া ও যন্ত্রণা বোধ হয়। সুতরাং তারা বুঝতে সক্ষম হল যে, জাতি, বর্ণ, ভাষা, রাষ্ট্র,

জাতীয়তাবাদ, ধন-দৌলত ও দরিদ্রতার ভিত্তিতে বনী আদমের শ্রেণী বিন্যাস করা নিতান্তই জাহিলিয়াত বলে বিবেচিত হবে।

এ মানবজাতি রাতের আঁধারে নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছে–

انا شهيد أن العباد اخوة ـ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষী যে তোমরা সকল বান্দা পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

অন্যদিকে দিনের আলোতে প্রকাশ্য জনসমুদ্রে ঘোষণা দেন–

يا ايها الناس كلكم وادم من ادم من تراب لا فضل لعربى على عجمى ولاعجمى على عربى ـ لا ابيض على سود ولا اسود على ابيض الا بالتقوى ـ

হে মানব জাতি! তোমরা সকলেই আদম সন্তান। আর আদম মাটির তৈরি। সুতরাং আরবদের জন্য অনারবদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর আরবদের উপর অনারবদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর না আছে কালোদের উপর সাদাদের আর না আছে সাদাদের উপর কালোদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার। শুধু শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যম হল তাকওয়া ও খোদাভীতি।

এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ

অর্থ ঃ হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ হতে। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি পরিচয়ের জন্য। তবে তোমাদের মাঝে অধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিই হল আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। (আল-হুজরাত ঃ ১৩)

নবীদের (আঃ) দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতি ঃ

নবীগণ (আঃ) স্ব স্ব যুগে এবং নিজেদের উম্মতের মাঝে এবং সর্বশেষ নবী (সাঃ) সকল নবীর পরে মানুষের আত্মশুদ্ধির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেন। তাদের সর্বপ্রচেষ্টা ছিল মানুষের ঐসব জন্মগত স্বভাব ও যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন

করা। যার সন্ধান তখনও পর্যন্ত কোন মনোবিজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়নি এবং তার গভীরে পৌছার ক্ষমতাও হয়ে উঠেনি।

নবীগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা বনী আদমের যোগ্যতাকে সুসংগঠিত করে তা ব্যক্তিগত ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের যোগ্য করে গড়ে তোলা। তাঁরা মানুষের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক আশ্চর্যজনক যাতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। মাখলুকের খেদমত করা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মানুষের আত্মিক প্রশান্তি প্রদান করা ও মানুষকে বিপদমুক্ত করা এখন তাদের সাধনায় পরিণত হয়েছে।

এখন মানুষ নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া এবং গভীরভাবে আত্মসমালোচনা করতে অভ্যস্ত হয়েছে। আখলাক ও এখলাছের এত সূক্ষ্ম অনুভূতি তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে যেখানে অত্যন্ত প্রখর মেধাবীদের মেধা পৌছতে সক্ষম হয় না এবং জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের জ্ঞান-গবেষণা তার গভীরতা নির্ণয় করতে অক্ষম। তাদের আখলাক ও এখলাছের সূক্ষ্ম বিষয়াদী সাহিত্য কর্ম ও কাব্যের মানানসই চিন্তা থেকেও অত্যন্ত স্পর্শকাতর যা ছোট ছোট অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ক্যামেরা দ্বারাও তার চিত্রাঙ্কন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

মোটকথা নবীগণের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মাঝে সূক্ষ্ম অনুভূতি, আত্মার পরিশুদ্ধি ও আখলাকের বুলন্দী সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আত্ম মর্যাদাবোধ। কিন্তু তা স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার প্রতি নিরাসক্তি, সৎসাহস ও চিন্তাশক্তির ঊর্ধ্বগতি এবং আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছে। নবীদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন শক্তি লাভ করেছে। আল্লাহর সত্তা ও গুণাগুণ সম্পর্কে এমন জ্ঞান অর্জন করেছেন যার সঠিক মূল্যায়ন কেবল ঐ ব্যক্তিই করতে সক্ষম যে ঐ সকল মহামনীষীদের জীবনগ্রন্থ গুলো নিয়ে সঠিক ও গভীরভাবে গবেষণা করেছে। মোটকথা, নবীদের (আঃ) মেহনতের মূল ময়দান ছিল মানুষ এবং এ মানুষই ছিল নবীদের (আঃ) মেহনতের মূল কেন্দ্রবিন্দু ও ক্ষেত খামার। এ ক্ষেত-খামারে তারা বীজ বাপন করেন। আর সে বীজ থেকে উৎকৃষ্টমানের সজীব বৃক্ষ জন্ম নিয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে কৃষকের দিল খুশিতে ভরে গেছে।

শুধুমাত্র উপায়-উপকরণ যথেষ্ট নয় ঃ

প্রাচ্যের দেশগুলোতে নবী (আঃ) গণের মেহনতের ময়দান শুধু এতটুকুই ছিল না যে, তাঁরা মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সাধনা করবেন। সেগুলো কাবুতে এনে তা দ্বারা বিস্ময়কর কারনামা আঞ্জাম দিবেন। কারণ তারা এর আবিষ্কারক ছিলেন না। তবে তাঁরা ভাল নিয়ত, ভাল ইরাদা ও উত্তম লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক ছিলেন। আর আপনাদের জানা বিষয় যে, ধন-দৌলত ও শিল্প-কারখানা তো সর্বদা মানুষের ইচ্ছা-শক্তির অধীন। আর তাই যখনই মানুষের ইচ্ছাশক্তি উত্তম হবে এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পাক-পবিত্র হবে তখনই তারা তাদের সীমাবদ্ধ ধন-দৌলত, শক্তি-সামর্থ ও সাধারণ এবং নগণ্য উপায়-উপকরণের মাধ্যমে বিস্ময়কর বড় বড় কল-কারখানা প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। যা সমকালীন যুগের উন্নত সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয়। তাঁরা এক মাধ্যমে মানুষ ও মানবতার এমন খেদমত করতে সক্ষম হয়েছেন যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ব্যক্তিরা করতে সক্ষম নয়। কারণ যখনই কোন বিষয় আঞ্জাম হয় তখন এর উপায় ও উপকরণ সামনে আসতে থাকে এবং সমস্যা সমাধান হতে থাকে। আর দৃঢ় সংকল্প পাহাড় ও সমুদ্রের বুক চিরে স্বীয় রাস্তা প্রস্তুত করতে সক্ষম। তাই যদি সৎসাহস ও নেক নিয়ত না থাকে তাহলে দুনিয়ার সব উপায় উপকরণ নিরর্থক ও মূল্যহীন। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার অপদার্থ সাব্যস্ত হবে। তাই পিপাসায় কাতর শিশুর অবস্থা জানতে মায়ের মমতা ভালবাসার তীব্রতা, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতাই যথেষ্ট।এর জন্য কোন বিজ্ঞান ও টেকনোলজির প্রয়োজনীয়তাবোধ করে না। তারা সর্বযুগে এবং সর্বস্থানে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়েছে। তাদের জানা আছে, কিভাবে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করবে।

নবীগণ নিজেদের সর্বোত্তম আদর্শ ও সুন্দর শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে মানুষের মাঝে সুদৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তারাও জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ বাস্তবায়ন করতে এবং এটাকে জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নিজেদের মাঝে ব্যাকুলতা অনুভব করত। যেমন ভাবে একজন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর মমতাময়ী মা এবং তার জন্য ব্যাকুল প্রিয়জনের শূন্যতা অনুভব করে।

ফলে এর পরিণতি হল এই যে, তার চলার পথ নিজ থেকেই সহজ হয়ে গেল এবং তার যুগের চাহিদা মোতাবেক উপায়-উপকরণ নিজ থেকেই অর্জিত হল। এভাবে এমন এক সভ্যতার জন্ম হল, যেখানে মানুষ পূর্ণ সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান লাভ করতে সক্ষম হয়। যদিও এ সভ্যতার

পরিসর সীমিত ও সহজ-সরল ছিল কিন্তু তার মাঝে কোন বক্রতা ও জটিলতা ও দার্শনিকভাব ছিল না। তবে তার মাঝে ভবিষ্যতে সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে উন্নতি, অগ্রগতি ও ব্যাপকতা লাভ করার পূর্ণ সুযোগ ছিল।

ইউরোপের নব রেনেসাঁ ঃ

এরপর শুরু হয় ইউরোপের কর্মব্যস্ততা, আবিষ্কার ও রেনেসাঁর যুগ। কিন্তু তৎকালীন ধর্মীয় নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্ত এবং অসৎ ধর্মীয় কর্তৃত্বের কারণে তাদের সাথে নীতি-নৈতিকতা এবং ধর্মীয় সম্পর্ক দুর্বল হতে লাগল। এ গভীর সম্পর্ক দুর্বল হবার কারণে ও সীমিত পরিসরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম তীব্র হবার কারণে পশ্চিমাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মানুষের পরিবর্তে মানুষের সমাজ ব্যবস্থা ও মানুষের আশ-পাশের জগতকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল। তারা মানুষের সত্ত্বাকে বাদ দিয়ে, মানুষের নফসকে বাদ দিয়ে, কলবকে ছেড়ে দিয়ে সৃষ্টি জগতকে তাদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করল। তারা খনিজ সম্পদ, রসায়ন, পদার্থ, টেকনোলজি, গণিত ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে নিজেদের যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করে অনস্বীকার্য বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করেছে, আর এটা আল্লাহ তাআলার একটি চিরাচরিত বিধান যে, যখন মানুষ কোন বস্তুর সন্ধান করে এবং সে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তা প্রদান করেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হল–

وَ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى ۔ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۔ ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۔

অর্থ ঃ মানুষ যা চেষ্টা করে সে তা পায় এবং তাকে অবশ্যই তার চেষ্টার ফল দেখান হবে। অতঃপর তাকে তার চেষ্টার পূর্ণ ফল দেওয়া হবে।

(সূরা আন্ নজম ঃ ৩৯/৪১)

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে–

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ط وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۔

অর্থ ঃ প্রত্যেককে সাহায্য প্রদান করে থাকি এবং তাদেরকেও আপনার রবের অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে। আর আপনার রবের অনুগ্রহ কেউ বন্ধ করতে পারে না। (বনী ইসরাঈল, আয়াত ২০)

ইউরোপের জাগতিক সমৃদ্ধি ঃ

সুতরাং পশ্চিমা বিশ্ব তাদের খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা দ্বারা ভূতত্ত্ব, শিল্প ও কারিগরি, গণিত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রে সফলতার চরম শিখরে উন্নিত হতে সক্ষম হয়েছে। তারা ধারাবাহিকভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ধারাবাহিক বিজয় তাদের পদচুম্বন করেছে। ফলে আজ তারা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে যা গতকাল পর্যন্ত কল্পনাতীত ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে উদ্দেশ্য নয়, এবং উদাহরণেরও এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে, এদেশও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পতাকাবাহী, পাশ্চাত্য সভ্যতার লালন ভূমি ও প্রাণকেন্দ্র। স্বয়ং এ মহান জ্ঞানগৃহ লন্ডন ইউনিভার্সিটি যেখানে আমি এ বক্তৃতা করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছি– এ সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের জন্য অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন সব উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছে যার ফল সায়েন্স ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা অনর্থক ও কালক্ষেপণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মোটকথা এসব উপায় উপকরণ সরবরাহ হয়েছে এবং এগুলোকে আমরা আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে মনে করি। আর এর অবমূল্যায়ন কোনভাবেই কাম্য নয়। সেসব উপায়-উপকরণসমূহের এক বিশাল স্তূপ আজ আমাদের চোখের সামনে। এ সব কিছু আবিষ্কারের উদ্দেশ্য হল দ্রুতগতিতে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আজ বিশ্বে যত সরঞ্জাম রয়েছে তার ন্যূনতম হলেও মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট হত। এ থেকে অনেক কম উপাদান হলেও বিশ্ব-মানবতা সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের সাথে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হত। আর এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেম-ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ, পরিবেশ তৈরি হতে পারত। মানুষ পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে সক্ষম হত এবং পরস্পরের মাঝে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে পারত। পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত বিশ্বমানবতার মাঝে সৃষ্ট কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হত। এ আধুনিক যুগে দুনিয়ার এক প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তির পক্ষে অন্য প্রান্তে অবস্থানকারী মানুষের জন্য কিছু করা সম্ভব হত। তারা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের দিলের স্পন্দন শুনতে পারত। তাদের চেহারায় পেরেশানীর ছাপ দেখতে সক্ষম হত এবং জালেমকে তার জুলুম হতে বিরত রাখতে পারত। মজলুম জনতাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারত। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াতে সক্ষম হত। বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত ও অসুস্থ মানুষের সাহায্য করতে পারত।

কারণ অজ্ঞতা ও মানবিক দুর্বলতার যেসব অভিযোগ ছিল তা দূর হয়ে গেছে। অতীতে এ ব্যাপারে অভিযোগ করা যেতে পারত কিন্তু বর্তমানে সে সুযোগ আর নেই। কারণ মানুষ বর্তমানে চোখের পলকে খাহেশাত পূরণকারী গণমাধ্যম ও উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এখন তো জনকল্যাণকর কাজ করার ক্ষেত্রে কোন ওজর-আপত্তি নেই। মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত কোন দেশ, সংস্থা বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন কমতি বা ঘাটতির অভিযোগ করার সুযোগ নেই।

উপকরণের ব্যর্থতা ঃ

এসব উপায়-উপকরণের মাধ্যমে বিপদ মছিবতে হাবুডুবু খাওয়া মানবতা এবং ক্ষত-বিক্ষত মানবজগতকে দুনিয়ার জান্নাত বানাতে সক্ষম হত। সেখানে না থাকত কোন মছিবত, কষ্ট-ক্লেশ, আর না রইত ভবিষ্যতের কোন ভয়-ভীতি এবং অতীতের কোন মানসিক দুঃখ বেদনা। যেখানে না রইত পারস্পরিক আত্মকলহ এবং অন্তরের হিংসাবিদ্বেষ, না কোন দারিদ্র্যতা ও রোগ-ব্যাধি। কিন্তু আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প প্রযুক্তির চরম উন্নতি সাধন হবার পরেও কি মানবতার কোন উদ্দেশ্য পুরা হয়েছে কি? দুনিয়া থেকে কি ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে? মানবতার আকাশ থেকে দারিদ্র্যতা ও পেরেশানীর তিমিরতা দূর হয়েছে কি? এখন কি মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার সংঘটিত হয় না? দুনিয়াতে কি বর্তমানে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বিরাজ করছে? এখন কি মানুষের মাঝে পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে?

পরিশেষে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, যুদ্ধের ভয়ানক চিত্র এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব মানবতা কি মুক্তি লাভ করেছে এবং যুদ্ধের অবাধ্য দৈত্যের চিরমৃত্যু হয়েছে? আমাকে এসব প্রশ্নের জন্য আপনাদের উত্তরের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এ ঐতিহাসিক শহর দু' দু'টি রক্তক্ষয়ী ধ্বংসযজ্ঞ বিশ্বযুদ্ধ স্বচক্ষে পরিলক্ষ করেছে এবং যুদ্ধের কারণে ধ্বংস ও বরবাদীর নির্দয় শিকারে পরিণত হয়েছে। আর বর্তমানে তো আমরা সবাই এটমি যুগে বসবাস করছি। স্বয়ং এ দেশের বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ স্বরচিত গ্রন্থ দ্বারা এক বিশাল গ্রন্থাগার উপহার দিয়েছে। সেসব গ্রন্থে এ সভ্যতার অত্যন্ত সূক্ষ্মচিত্র অঙ্কন করেছে। তারা এ সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট মছিবত ও ধ্বংসের উপর বিলাপ করেছে। নৈতিক অধঃপতন, পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা, মানসিক দুরবস্থা, সর্বসাধারণের মাঝে বিস্তৃত ভয়-ভীতি নিয়ে লেখা তাদের মৌলিক বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আর তারা যা লিখেছে এবং যা লিখছে তা স্বীয় অবস্থানে যথেষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত।

ভুল কোথায়?

পরিশেষে বলতে হয়, বিজ্ঞানের এ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থেকে কেন এ তিক্ত পরিণতির সৃষ্টি হল। অথচ এসব যন্ত্রপাতি, উপায়-উপকরণ ও প্রযুক্তি দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তিহীন, তাদের নিজস্ব কোন ইচ্ছা শক্তি নেই। এসব প্রযুক্তি তো সদা-সর্বদা মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত। এ প্রশ্নের উত্তর কোন গোপন তথ্য উদ্ঘাটনে নয়, বা অতীত কোনকিছু বুঝার বিষয় নয় বা এ ক্ষেত্রে কোন তীক্ষ্ণ মেধার প্রয়োজন রয়েছে। বরং এটি একটি সহজ সরল কথা যে, বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে পরিমাণ উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করেছে সে পরিমাণ মানবিক গুণাগুণ অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। উপায়-উপকরণ এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান তো প্রচুর উন্নতি লাভ করেছে কিন্তু মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং ইচ্ছাশক্তিতে কোন কল্যাণবোধ ও নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি হয়নি। বরং এটা বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের আখলাক-চরিত্র ও নীতি নৈতিকতার অধিকার হরণ করে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করেছে। অন্তরাত্মার অধিকার আত্মসাৎ করে মিল-কারখানাগুলো সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।

বর্তমানে মানবতার দেমাগ জীবিত কিন্তু দিল মৃত!

এর পিছনে মূল কারণ হল, যদিও অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, পশ্চিমা বিশ্ব তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, চিন্তা-ফিকির ও ইচ্ছাশক্তির মূল কেন্দ্রবিন্দু মানুষের বাহ্যিক জগতকে নিয়ে বানিয়েছে। আর এ বাইরের জগতকে ঘিরেই তাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনাকে কুরবান করেছে। অন্যদিকে তারা মানুষকে উপেক্ষা করেছে। অথচ মানুষই হল এ বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ ফুল এবং শুধুমাত্র তাকে কেন্দ্র করেই এ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষই হল আল্লাহ তায়ালার কুদরতী হাতে তৈরি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অথচ এ মানুষই সকল প্রকার উন্নতি ও অগ্রগতি হতে মাহরূম রয়েছে। যদি কখনও মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এদিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকে তাহলে তা খুব সীমিত পরিসরে এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের গভীরে পৌছাবার চেষ্টা করা হয়নি। তার স্বভাব ও চরিত্রও মানবিক গুণাগুণকে জনসম্মুখে আনার চেষ্টা করা হয়নি। তার বিশেষত্বগুলোকে, তার ঈমান-আকীদা-বিশ্বাসকে, তার আখলাক-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতাকে সুন্দর করার চেষ্টা-ফিকির করা হয়নি।

মানবতার তালা একমাত্র ঈমানের চাবি দ্বারাই খোলা সম্ভব ঃ

বস্তুবাদী এসব গবেষকগণ ঐ চাবির সন্ধান প্রাপ্ত হয়নি যার মাধ্যমে তারা মানুষের মনোভাব পাল্টিয়ে তা সঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে সক্ষম হত। যদ্দ্বারা তারা খারাপ ও অকল্যাণকর বস্তু হতে রক্ষা করে কল্যাণ ও জনহিতৈষীকর কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম হত। বস্তুত সে চাবি হল মানুষের ক্বলব। যদি তা ঠিক হয়ে যায় তাহলে মানুষ ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সারা মানব দেহই অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, পশ্চিমা বিশ্ব ইচ্ছা করলেও ক্বলব-এর জগৎ উদ্ঘাটন করতে সক্ষম নয়। আর ক্বলব থেকে উপকৃত হওয়া, তাকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করা এবং তার মাধ্যমে মানবতাকে সুপথে পরিচালিত করা আরো দুরূহ ব্যাপার। কারণ, তালার বৈশিষ্ট্যই হল নির্ধারিত চাবির মাধ্যমে তা খোলা সম্ভব। আর মানুষের দিলের জানালার একটি তালা রয়েছে এবং এ তালার চাবি মানুষের ধাতব কারখানা বা জ্ঞানগৃহগুলোতে প্রস্তুত হয় না। দুনিয়ার বিখ্যাত কোন বিজ্ঞানী এ চাবি প্রস্তুত করতে সক্ষম নয় এবং এর বিকল্প আবিষ্কার করতে সক্ষম নয়। আর এ তালা ভেঙ্গে ফেলাও সম্ভব নয়। কারণ, এটা মানবতার তালা, ব্যাংক বা কারখানার তালা নয়। তাই এ তালা শুধুমাত্র ঈমানের চাবি দ্বারাই খোলা সম্ভব। আর এটা নবুওয়তের তোহফা। কিন্তু তা আজ হারিয়ে গেছে। নতুন সভ্যতা সংস্কৃতির বিধ্বস্ত প্রাচীরের নিচে অথবা এবাদত গৃহের পতিত ইট-সুরকির নিচে দেবে পড়ে আছে।

মৌলিক খারাবির কারণ ঃ

এ ক্ষেত্রে মানবতার মসিবতের জন্য মূল কারণ হল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে বিভাজন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঈমানের মাঝে দূরত্ব। এ দূরত্ব ও বিভাজন আমাদের সভ্যতাকে সব ধরনের মসিবতগ্রস্ত করেছে। প্রাচ্যের দেশগুলোতে ঈমানের হাওয়া বইতে লাগল, ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টি হতে লাগল। আর অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করল। তাই প্রয়োজন ছিল ঈমান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাঝে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। জরুরত ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তদারকি করবে ঈমান। সুতরাং বিশ্ব মানবতার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঈমানের মাঝে হৃদ্যতাপূর্ণ সুসম্পর্কের ও পরস্পরের মাঝে সাহায্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। কারণ এ ভাবেই সৃষ্টি হতে পারে এক নয়া সভ্যতা, একটি নতুন জাতি। সৌভাগ্যের এ দু'পরশ পাথরের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে।

প্রাচ্যের উপহার ঃ

আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, প্রাচ্যের মূল সম্পদ পেট্রোল নয়, যাকে কালো স্বর্ণ বলা হয়ে থাকে। এ পেট্রোলকে আপনারা নিজেদের বড় বড় শহরে স্থানান্তর করে থাকেন। এ পেট্রোলের মাধ্যমেই বিমান উড়তে সক্ষম, মোটরগাড়ি চলতে পারে। বস্তুত প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ উপহার ও কল্যাণকর হাদিয়া হল ঈমান যা ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রথম শতাব্দীতে অর্জিত হয়েছিল। অতঃপর এ ঝর্নাধারা পুনরায় খৃস্টপঞ্জিকা অনুপাতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এমন তীব্র বেগে প্রবাহিত হয় যার দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে পাওয়া অসম্ভব। এ ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয়েছিল আরবদেশে। অতঃপর তা সারা বিশ্বে এভাবে প্রবাহিত হয়েছে যার বিবরণ কবির ভাষায় পাওয়া যায়–

رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی ÷ ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی

এ আবেহায়াত থেকে বেমাহরূম ছিল না জল স্থল
তার পরশে সজীবের ছোঁয়া পেল খোদার বনাঞ্চল।

এ ঈমানের ঝর্ণাধারা আজকেও আপনার জন্য অতি সহজলব্ধ। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল সৎসাহস ও আন্তরিক সদিচ্ছা। সভ্যতা-সংস্কৃতির কারণে বিশ্বমানবতা যেসব বিপদ মসীবতে জর্জরিত তা দূর করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে। এ ঝর্ণাধারা এখনও এ যোগ্যতা রাখে যে, তার পূর্ণ উদ্যমতা ও আবেহায়াত দ্বারা এক নবজীবন ও দিগ্বিজয়ী নবউদ্যমতা দান করতে পারে। ফলে এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার উন্নতি ও অগ্রগতির এক নবযুগের সূচনা হতে পারে। এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হতে পারে। আর এ মহান কাজের দায়িত্ব পালনের আপনারাই অধিক যোগ্য। কারণ আপনারাই হলেন নবুয়তী সভ্যতার পতাকাবাহী এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্যের দেশগুলোতে আপনারাই এ পয়গামের ধারক-বাহক ছিলেন। আপনাদের মাঝে এখনও সে বৃহৎশক্তি ও সুপ্ত প্রতিভা লুক্কায়িত রয়েছে যদ্বারা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে এবং ইতিহাসের এক নতুন ধারা সৃষ্টি হতে পারে। পবিত্র কুরআন এখনও আপনাকে এ সুসংবাদ প্রদান করে।

(এ বক্তৃতাটি ১৯৬৪ সালে বার্লিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে করা হয়েছিল)

জার্মান জাতির নামে খোলা চিঠি

গ্রেট জার্মান জাতি!

আজ ঐতিহাসিক বার্লিন শহরে জার্মান জাতির সামনে বক্তৃতা করা এবং ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরার সুযোগ হচ্ছে আমার। এটা একটি হৃদ্যতাপূর্ণ মূল্যবান সুযোগ। ফলে এর গুরুত্ব ও নাজুক অবস্থার প্রতি আমি সজাগ রয়েছি।

জার্মান জাতি যুগ যুগ ধরে বীরত্ব, যুদ্ধজয়ী, ধীরস্থিরতা, কর্মশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তাদের মাঝে এমন দৃঢ়চেতা ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী মনীষী জন্ম নিয়েছে যারা পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে চাই। যারা প্রত্যেকেই ইউরোপের দিল ও দেমাগের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই এক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের একজন হলেন মার্টিন লুথর। তিনি গির্জার সংস্কার, পবিত্র ইঞ্জিলের প্রতি আস্থাশীল ও অনুরাগী হওয়া এবং পোপ ও পাদ্রীদের নিয়ন্ত্রণহীন কর্তৃত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রতি দাওয়াত দেন। এভাবে তিনি ইউরোপীয়ান খৃস্টানদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তিনি একজন স্বাতন্ত্র্য মতাদর্শের জনক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

জার্মানের দ্বিতীয় খ্যাতিমান ব্যক্তি হলেন গোয়েটে। তিনি সর্বদা প্রাচ্যের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মুহাব্বত রাখতেন। প্রাচ্যের কাব্য, সুর ও ছন্দের প্রতি আকর্ষণ রাখতেন এবং সেখানকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে গভীর লেখা পড়া করেন এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি জার্মান কাব্য ও সাহিত্যে নিজের অপ্রতিদ্বন্দ্বি কর্ম সম্পাদন করেন।

জার্মানের তৃতীয় মনীষী হলেন, কান্ট। তিনি নিরেট বুদ্ধি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্র ও সীমানা নির্ধারণ করেন। আধুনিক যুগে তাকেই দূরদর্শী বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য করা হয়। পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা ও পাশ্চাত্য দর্শনের উপরে তাঁর ও তাঁর মুক্ত বুদ্ধি পর্যালোচনামূলক দুটি গ্রন্থের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এ তিনটি আন্দোলন ও চিন্তা শিবির উদ্যমতা, বিপ্লব ও নতুনত্বের ক্ষেত্রে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের প্রত্যেকেই এক একটি বিপ্লবী চেতনার

অধিকারী। এ কথার স্বীকৃতি শুধু জার্মানীদের পক্ষ থেকে নয় বরং গোটা ইউরোপের দাবীই হল এটা।

জার্মান জাতির বৈশিষ্ট্য ও সৎসাহস ঃ

বিপ্লব ও বিদ্রোহ এবং মানসিক অস্থিরতা জার্মান জাতির সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তাদের এ বিপ্লবী ও বিদ্রোহী মনোভাব এবং মানসিক অস্থিরতা কার্ল মার্ক্সের ব্যক্তিত্বের আকৃতিতে পূর্ণ দাপটের সাথে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তিনি বিশ্বের বিরাট একটা অংশে বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং তার এ বিপ্লবকে বর্তমানে বিশ্বের প্রাচীন অর্থনীতির বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ বিপ্লব বলা হয়।

আমি যে সব আন্দোলন ও মতাদর্শের কথা উল্লেখ করলাম সেগুলোকে মূলতঃ বিপ্লব ও বিদ্রোহ বলা যেতে পারে। তবে কখনও এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল আবার কখনও এর পরিসীমা সংকীর্ণ ও সংকুচিত ছিল। আবার কখনও সমাজে এর প্রভাব গভীর ছিল আবার কখনও এর প্রভাব নগণ্য ছিল।

জার্মান জাতির সাথে সৎসাহস ও দুঃসাহসিকতা দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন ও দুনিয়াতে সুউচ্চ আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার তুমুল আগ্রহ ও উদ্যমতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে (১৯৩৫-১৯৪৫) মূলতঃ দু'টি বিপ্লব বা বিশ্বজয়ের দু'টি মরণপণ লড়াই বলা যেতে পারে। এটা শুধুমাত্র এ কথার পরিণতি যে, এ মহান জাতির মাঝে একটি উদ্দীপনা ও বিশ্বজয়ের মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। ফলে তাদের মাঝে যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাঝে দুঃসাহসিকতা দুর্জয় মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্যমতা, দুর্বার ও দুর্জয় মনোভাব, উন্নতি ও অগ্রগতির যোগ্যতা তাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এবং তা এখনও পূর্ণমাত্রায় তাদের মাঝে বিরাজমান। যদি এ বাস্তবতা তাদের মাঝে না থাকত তাহলে জার্মান জাতি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হত না। তারা এ প্রলয়ঙ্কর বিধ্বস্ততা মুকাবেলা করতে সক্ষম হত না যা একটি জাতির যোগ্যতাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল এবং জীবন থেকে নিরাশ করে দেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দালান-কোঠা এবং অচল কারখানার আবর্জনা হতে এ সভ্যতা-সংস্কৃতি, এ শিল্প-কারখানা, এ উদ্যমতা ও কর্মশক্তি ফিরে পাওয়া অসম্ভব ছিল। তা যদি না হত তাহলে জার্মান জাতির পক্ষে পুনরায় নব উদ্যমে, নতুন কর্মশক্তি নিয়ে এবং নতুন জীবন জয়ের স্বপ্ন নিয়ে জীবন যুদ্ধ মুকাবেলা করার যেগ্যতা রাখত না।

জার্মান জাতির দুর্ভাগ্য ঃ

কিন্তু এ মহান জাতির এ অভিজ্ঞতা, দিগ্বিজয়ী স্বপ্ন, সীমিত বিদ্রোহ ও বিপ্লব ছাড়া আগে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। যেভাবে এর সূচনা হয়েছিল যা আমি প্রথমে আলোচনা করেছি। অথচ পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় এর একটি মূল্যায়ন রয়েছে এবং তাদের এ বিশেষত্ব জার্মান জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি অগ্রগতি ও স্থায়ী খ্যাতি দান করেছিল। এ সত্ত্বেও তারা ইউরোপীয় ধর্মীয় ও মানসিক শৃঙ্খলা গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়নি। তারা সক্ষম হয়নি সনাতন বিশ্ব ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে।

বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ঃ

বিগত বিশ্বযুদ্ধ দুটি কোন মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়নি। কিম্বা খৃষ্টিয়বাদ প্রতিষ্ঠা করা বা উচ্চ নীতি নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত করা বা মানবতার কল্যাণের জন্য এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এ যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এটাও ছিল না যে, জালেম ও পাপীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কোন হৃদয়বান মহানুভব ন্যায়-নিষ্ঠাবান লোকের হাতে তুলে দেয়া হবে। অথবা এ বিশ্বযুদ্ধ খোদাদ্রোহীতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনা হতে মুক্তি দেবার জন্য সংঘটিত হয়নি। বরং আমাকে মাফ করুন এ বিশ্বযুদ্ধ শুধুমাত্র নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের জন্যই সংঘটিত হয়েছে। বরং আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই এ যুদ্ধ তো এজন্য হয়েছিল যে, দুনিয়ার লুটতরাজী, জুলুম-অত্যাচার, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সবকিছুই ঠিক থাকবে কিন্তু তা সবই কোন একদলের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে হতে হবে।

জার্মান জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

এ মহান জাতির মর্যাদার দাবী তো ছিল এটা যে তারা ঐ সব বিপ্লব, যুদ্ধ ও বিদ্রোহ থেকে অধিক প্রশস্ত ও দীর্ঘমেয়াদী কোন বিপ্লব দুনিয়ার সামনে পেশ করত। এমন বিপ্লব যা শুধু জার্মান বা ইউরোপে নয় বরং সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণকর হত। এমন এক বিপ্লবের জন্ম দিত যার মাধ্যমে বিশ্বমানবতার প্রকৃত সুখ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা অর্জিত হত। এমন এক ইনকিলাব সংঘটিত করত যা নতুনত্ব ও আধুনিকতা, সৎসাহস ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে অন্য সকল বিপ্লব থেকে অধিক কল্যাণকর হত যা সংঘটিত হয়েছিল দূর অতীতে বা নিকট অতীতে গ্রেট জার্মানদের মাধ্যমে।

এখনও জার্মান পশ্চিমা বিশ্বের পূর্ণ সহযোগী। বরং শিল্প কারিগরি ও অধিক উৎপাদনশীল বীজ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় পশ্চিমা বিশ্ব থেকে অগ্রগামী ভূমিকা রাখে। ফলে তারা জীবনকে সহজকরণ উপায় উপকরণ

আবিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার অংশ শুধু আবিষ্কার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের মেধা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কঠিন অধ্যবসার পরিচয় দান করেছে এবং তারা তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রয়েছে। তারা আজকের বিশ্বে শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে।

এদেশ বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র ও সংগ্রামের লীলাভূমি। বিপ্লবী ও সংগ্রামী এ জার্মান জাতি থেকে এ প্রত্যাশা করা যেত যে, তারা এমন এক সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যা মানুষকে একটি পথভ্রষ্ট লাগামহীন প্রাণীতে পরিণত করেছে। মানুষকে একটি বিধ্বংসকারী অস্তিত্বে পরিণত করেছে। এ সভ্যতা মানুষকে একটি অন্ধ ও নির্বাক মেশিনে পরিণত করেছে। ফলে এখন মানুষের মাঝে না রূহের অস্তিত্ব আছে আর না আছে দিলের সন্ধান। না আছে তার কোন আক্বীদাহ-বিশ্বাস আর না আছে মানবিক মূল্যবোধ। এ সভ্যতা সমগ্র বিশ্বকে একটি শরাবখানা, একটি কসাইখানাতে পরিণত করেছে। মানবজীবনকে রূপান্তরিত করেছে কেনাবেচা ও লেনদেনের একটি বিপণী কেন্দ্র। এ সভ্যতা মানুষের জীবন থেকে নতুনত্ববোধ, জীবনের স্পন্দন ও উষ্ণতাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। জার্মান জাতির দায়িত্ব ছিল এ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করবে। কারণ এ সভ্যতা মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে এমন সব সমস্যা যা শেষ হবার নয়। এ সভ্যতা মানুষকে এমন এক প্রতিযোগিতার ঘোড়াতে পরিণত করেছে, যা শেষ হবার নয়, এমন এক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে যার কোন শুভ পরিণতি নেই। এ সভ্যতা আধুনিক যুগের মানুষগুলোকে কলুর বলদে পরিণত করেছে, যা আজীবন এক স্থানেই ঘুরপাক খাই। এ সভ্যতা মানুষের মহামূল্যবান সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, মানুষকে তার আত্মমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে। এ হারানো সম্পদ ও মর্যাদা হল, ঈমান ও একীন, নিষ্কলুষ ইখলাস, বিশ্বমানবতার প্রতি পবিত্র মুহাব্বত, ব্যথা ও বেদনাবোধ।

তাদের থেকে এ আশা করা যেত যে, ইউরোপের কোন এক দেশ ঐসব আধুনিক মিথ্যা মতাদর্শ ও কৃত্রিম ক্ষমতার দাপট এবং আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে যেগুলোকে মানুষ লালন-পালন করে থাকে। কারণ কৃত্রিম এসব আধুনিক মতাদর্শ ও আভিজাত্য মানুষের জীবনে এমন সব চাহিদা ও মান-সম্পন্ন অত্যাধুনিক ফ্যাশনের অহেতুক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। মানুষের জীবনে এমন

অহেতুক ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেয় যা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনকে কলুষিত করে এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাকে হরণ করে।

সুতরাং বিশেষভাবেই এ জার্মান জাতি হতে এ আশা করা যেত যে তারা এ পুণ্যময় ও প্রকৃত বিপ্লবের ঝাণ্ডাবাহী হয়ে শুধুমাত্র স্বদেশের নয় সমগ্র বিশ্বের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নবযুগের সূচনা করবে। কারণ, ইউরোপ তাদের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়নি।

জার্মানের ভুল ঃ

এ সত্ত্বেও জার্মান পশ্চিমা বিশ্বের একটি সুবোধ সদস্য হয়ে রয়েছে। যারা তার সাথে সমতা বজায় রাখে না, যারা তাকে সর্বদা হিংসার দৃষ্টিতে দেখে তাদের সাথে আগের মত সদাচরণ করে আসছে। তাদের সাথে আগের মতই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি রাখে এবং দিল ও দেমাগ দ্বারা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা, তাদের সেবা করার ব্যাপারে সচেষ্ট রয়েছে। জার্মান জাতি ইউরোপের দেওয়া নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। তারা নিজেদের এবং বিশ্বমানবতার ভাগ্য পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ঐ মহান সংগ্রাম সাধনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যদ্বারা তারা বিশ্বের নেতৃত্বে স্থায়ীভাবে সমাসীন হতে পারত এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে তার একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান হত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে তার ইজ্জত-সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি হত। জার্মান যদি সভ্যতা-সংস্কৃতির এ কৃত্রিম ও অতি সংকীর্ণ পরিধি ভাঙ্গতে সক্ষম হত যার যাতাকলে ইউরোপ দীর্ঘদিন পিষ্ট, তাহলে তাদের এ দুঃসাহসিকতার মোকাবেলা করার মত সাহস ইউরোপের আর কারো হত না। তারা যদি এ অসাধ্য কাজ সাধন করতে পারত তাহলে পুরাতন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এ ব্যবধান চুরমার করে দুনিয়াকে বস্তুবাদ, পশুত্ব, হিংস্রতা ও ঐসব কঠিন পরিণতি হতে মুক্ত করতে সক্ষম হত যা বিজ্ঞান সহজ করে দিয়েছে। জার্মান যদি মানবতার এ মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হত তাহলে তাদের এ বিপ্লবের সামনে ইউরোপের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল কর্মতৎপরতা বাচ্চাদের খেল-তামাশা ছাড়া আর অধিক বাস্তবতা বলে মনে হত না।

ইউরোপ গমনকারী ছাত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সুপ্রিয় বৎসগণ!

আমি সাত সমুদ্র পার হতে আগত জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মুবারকবাদ ও সালাম পেশ করছি। এমন সালাম যা আমার নিষ্ঠা ও

ইসলামী ভাবধারার আয়না ও প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরিগণিত হয়। আমার কাছে আপনাদের বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানকারী ইউরোপ ও আমেরিকা গমন করা বা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ও জ্ঞানগৃহগুলোতে পদচারণা করা, ইউরোপের শিল্প-কারখানা ও কর্মতৎপরতায় আপনাদের সহাবস্থান বা দায়িত্ব পালন করা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঘটে গেছে এমন নয়, অথবা হতাশ হবার মত কোন ঘটনাও নয়।

আপনাদের এ সফর কয়েক দিনের হতে পারে আবার স্থায়ী হিজরতের জন্যও হতে পারে। আর এ সফর যে কোন কারণে হতে পারে। মোটকথা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান সুযোগ, একটি অকৃত্রিম দান ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এমন দান ও অনুগ্রহ পেয়ে মুসলমান ও ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস অধিকাংশই এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এ সফর আপনার ব্যক্তি জীবনের জন্যও মঙ্গলজনক আবার বিশ্বনেতৃত্ব প্রদানকারী নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্যও মঙ্গলজনক। নতুন সমাজ ব্যবস্থা বলতে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ আমেরিকা ও রাশিয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। এ সুযোগে আপনার মাঝে ইসলামের প্রতি একীন ও আত্মবিশ্বাস, কুরআন মজীদের প্রতি পূর্ণ ঈমান ও আস্থা এবং নবীদের দাওয়াত ও শিক্ষার প্রতি আস্থা, বিশেষতঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও দাওয়াতের প্রতিপূর্ণ আস্থা ও একীন অর্জিত হবে। কারণ প্রিয় নবী (সাঃ) এর নবুওত ও দাওয়াত তাঁর পবিত্র শিক্ষা-দীক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং বর্তমানেও তার মাঝে রয়েছে সর্বজনীন স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা। আপনি বর্তমানে ইউরোপের এক নতুন আলোক রশ্মির সামনে অবস্থান করছেন। এ নতুন আলোকরশ্মি ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থার সকল জড়তা ও কর্মহীনতা খতম করে, বন্ধাত্ব ও অনুকরণ প্রিয়তাকে শেষ করে চিন্তা-চেতনা, ফালসাফা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করছে। বরং এ ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে আজ মানবজীবনে সৃষ্টি হয়েছে নবোদ্যমতা।

পশ্চিমাদের জীবন দর্শন ঃ

হে মুসলিম তরুণ দল!

আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এ আধুনিক সভ্যতার প্রবক্তাদের ধারণা বরং দাবী হল, এ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ঈমান আকিদা বিশ্বাসের কুসংস্কার ও আখলাক-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শ এবং আসমানী পয়গামকে পরিত্যাগ করেও অটল থাকা যেতে পারে; বরং

তাদের শ্লোগান হল, এসব পরিত্যাগ করে হলেও আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করা উচিত। কারণ এ সভ্যতার ভিত্তি হল, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, কারিগরি, শক্তিশালী অর্থনীতি, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার উপর। আর এ কারণেও এ সভ্যতা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ, সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি শুধুমাত্র এসব আধুনিক প্রযুক্তির সাথেই সম্পৃক্ত। আর এসব আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র দ্বারা।

আধুনিক সভ্যতার প্রবক্তাদের দাবী হল, সমাজের সফলতা ও মানুষের কামিয়াবী হল, সে তার মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি জগতকে করায়ত্ত করা, যা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব। তাদের দাবী হল, অতীতে মানুষের ব্যর্থতা ছিল যে, তারা পরস্পরের সাথে মত বিনিময় করতে সক্ষম ছিল না। কারণ তখন বিশ্ব বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল।

ইউরোপ তাদের দাবী ও মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর। তারা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনড় ও উদ্যমতাময় অবস্থানে রয়েছে। যা কেবল একজন নওমুসলিম অথবা সে মতাদর্শের প্রবক্তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। তাদের একটি মাত্র দাবী–

لا اله ولا دين ولاغيب ولاايماة ولا روح ولا اخرة ـ

আল্লাহ বলতে কিছু নেই, দ্বীন বলতে কিছু নেই, অদৃশ্য বলতে কিছু নেই। আর না আছে রূহানীয়াত ও আখেরাত। তাদের কাছে শরীয়ত ও আধ্যাত্মিকতা শুধু কুসংস্কারের নাম। মূল বিষয় হল, অনুভূতি, উপলব্ধি, আনন্দ ও ফূর্তি, জাতীয়তা ও দেশত্ববোধ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, কমনিজম ও সমাজতন্ত্র।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষতিকর দিক ঃ

এ ক্ষেত্রে আমি এ মতাদর্শের প্রবক্তা ও পতাকাবাহী এবং এ সভ্যতার সমালোচকদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে চাই। তারা পাশ্চাত্য মতাদর্শকে কয়েকভাগে বিভক্ত করেছে। এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন মতাদর্শ পরিলক্ষিত হয় এবং সকল মতাদর্শের ছাপ তাদের সাহিত্যকর্মে ফুটে ওঠে। ইউরোপে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ঐসব মতাদর্শ হতে উপকৃত হয়েছে এবং সকলের প্রভাব গ্রহণ করেছে। তবে সকল মতাদর্শের মূল ভিত্তি হল বর্তমানে ইউরোপের পূর্ণ সুযোগ এসে গেছে যে, তারা তাদের বিশ্বাসগত মূলনীতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাহসিকতার সাথে বাস্তবায়ন করবে। এটা ইতিহাসে বিরল ও অত্যাধুনিক ঘটনা। কারণ তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এমন সহজলব্ধ উপকরণ ও প্রযুক্তির আধিক্যতা তাদের কাছে

রয়েছে যা ইতিহাসে খুব কমই ঘটে থাকে। বর্তমানে তাদের নেতৃত্বের মুকাবেলা করা বা তা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত শক্তি বা তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন শক্তি নেই বললেই চলে। ইউরোপের বস্তুবাদী ও লাগামহীন মতাদর্শের তুফানে গির্জার কর্তৃত্ব ভেসে গেছে। আর গোটা মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তা-চেতনা, স্নায়ু ও শীতল যুদ্ধের সামনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আত্মসমর্পণ করেছে। আর এভাবেই বর্তমান বিশ্বের সকল দেশ– পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সকলেই তার সামনে সিজদাবনত হয়ে আছে।

সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপের পক্ষে তার সকল যোগ্যতাকে বস্তুবাদের আকৃতিতে উপস্থাপন করার সুযোগ এসে যায়। আর এ সুযোগে তারা বস্তুবাদকে দুনিয়ার স্টেজে শ্লোগান, করতালি ও সমর্থনমূলক ধ্বনি দ্বারা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু প্রচণ্ড মেধার অধিকারী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মঞ্চস্থ সাজানো নাটক স্বীয় লক্ষ-উদ্দেশ্য ন্যক্কারজনকভাবে ব্যর্থ হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলশ্রুতিতে আজ প্রকাশ্যে ও গোপনে সমাজের আপামর জনসাধারণ, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ও ভাই-ভাইয়ের মাঝে মানসিক অস্থিরতা ও যুদ্ধের ভয়ঙ্কর মেঘ ঘণীভূত হয়ে আছে। পরস্পরের মাঝে অগ্নিগিরির মত সম্পর্ক। তা যে কোন মুহূর্তে অনল বর্ষণ করতে পারে। মানবতার দুঃখজনক পরিণতির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পরস্পরের প্রতি আত্মবিশ্বাস, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে তার শিরা-উপশিরা, দিল ও দেমাগে ভয়-ভীতি ছেয়ে গেছে। এক বিরামহীন অস্থিরতা, নৈতিক বিশৃঙ্খলার কল্পনাতীত তুফান, অপূরণীয় আধ্যাত্মিক শূন্যতা, এলাজহীন হতাশা তার মাঝে, বরং বলা যেতে পারে পাশ্চাত্য সভ্যতা হল হতাশা, অস্থিরতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের একজগত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসিক অস্থিরতার কাহিনী সব সময় বর্ণনাযোগ্য এবং তা বারবার শ্রবণ করা উচিত। কারণ এটা মানব জীবনের বরং মানব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা অধ্যায়। কেননা, প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে এমন কিছু লোক এখনও রয়ে গেছে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, পবিত্র বলে পূর্ণবিশ্বাস রাখে। তাদের বিশ্বাস হল, পাশ্চাত্য সভ্যতা এমন এক সভ্যতা যা কখনো শেষ হবার নয় বা কখনো দেউলিয়া হবার নয়। সুতরাং এ সভ্যতাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন।

বস্তুবাদী সভ্যতার খারাবী

মুসলিম যুবকেরা!

আপনারা এ সভ্যতার মাঝে থেকে এ আগুনের তাপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন। কারণ, আপনারা এখানের আবহাওয়াতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। আপনারা এখানের অস্থিরতা ও বিচলিত অবস্থা এবং সর্বত্র এর ব্যর্থতার ছাপ দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন এখানের রাজনীতিবিদদের আখলাক-চরিত্র ও তাদের নীতিহীন কর্মকাণ্ডের মাঝে। কারণ তাদের অন্তরে মানবিক গুণাগুণ ও অনুভূতির কোন মূল্য ও মূল্যায়ন নেই। তারা সমাজ জীবনে মানুষের অবমূল্যায়নকারী, ভদ্রতা ও মানবতাবোধকে তারা পদদলিতকারী, নৈতিক অবক্ষয় ও সমাজ জীবনে ফ্যাসাদ ও অপরাধকে সমষ্টিগতভাবে বিস্তার ঘটাতে অভ্যস্ত। আপনারা এসবকিছুই দেখতে সক্ষম রাজনীতি ও চিন্তার জগতে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিদের মাঝে তারা মানবতার পয়গামকে উপলব্ধি করা ও তা অন্যের কাছে পৌঁছাতে অক্ষম ও ব্যর্থকৃতকার্য। তারা মানবতাবোধ শূন্য। অথচ এ মানবতাবোধের মাধ্যমে সমাজে প্রাণের স্পন্দন ও জীবনের উচ্ছাস পরিলক্ষিত হয় এবং যা মানবগোষ্ঠীকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করতে সাহায্য সহযোগিতা করে।

এ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি যা আজ আধুনিকতা ও জাগ্রত মস্তিষ্কের দিক থেকে তো পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে গেছে কিন্তু মানুষের আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে রিক্তহস্ত হয়ে আছে।

এসব নমুনা ও চাক্ষুষ প্রমাণ দেখার পর আপনাদের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত, যে সমাজব্যবস্থা ঈমানী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হবে তার পরিণতি ধ্বংস ও বরবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত এর সময় কিছু বিলম্ব হতে পারে এবং এর শক্তি কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু পরিণতি তার ধ্বংস ও বরবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়।

মূলত ঈমান ও একীনের রাস্তাই হল আম্বিয়া ও রাসূলগণের দাওয়াত ও সীরাত, যা মানুষের জীবনে, উম্মত ও জাতি গঠনে, ঈমান ও আখলাকের উষ্ণতা ও রূহ সৃষ্টিতে মানবীয় গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনে এক নূরানী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর গুণাবলী ছাড়া মানব জীবনে সকল উন্নত আদর্শ দ্বারা শোভামণ্ডিত করে। ইউনিভার্সিটি, কলেজ বা অন্য কোন একাডেমিক শিক্ষা বা গণমাধ্যম ছাড়াই তাদের থেকে সরাসরি ঈমান ও সৎসাহসের রূহ পেয়ে ধন্য হওয়া সম্ভব। তাদের মাধ্যমে দিল থেকে লোভ-লালসা, প্রতারণাময় লৌকিকতার

মুহাব্বত দিল থেকে বের হয়ে যায়। আম্বিয়াগণ মানুষকে উজ্জীবনী শক্তি প্রদান করে থাকে। তাদের মাঝে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ও মূল্যায়ন, দুনিয়ার অসারতার প্রতি বিশ্বাস, কুরবানী ও স্বার্থহীনতার আগ্রহ সৃষ্টি করে। আম্বিয়াগণ অদৃশ্য খোদার প্রতি ঈমান আনতে এবং আল্লাহর জন্য জীবনোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। আম্বিয়াগণের জীবনীগ্রন্থ ও তাদের ইতিহাস আজো আত্মার খোরাক দান করে। যদি তাদের ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহ 'তাওয়াতুরে'র পর্যায়ে না পৌঁছত তাহলে মানুষ তা মিথ্যা বলতে কুণ্ঠাবোধ করত না। আম্বিয়াগণই হলেন এমন এক মানবগোষ্ঠী যারা মানবসভ্যতার অবশিষ্ট পুঁজিকে হেফাজত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বার বার সমাজ ব্যবস্থাকে পশুত্ব, খাহেশাত ও মনচাহী জিন্দেগী থেকে নাজাত দান করেন। তাঁরা মানবতার ডুবন্ত জাহাজকে জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তাঁরা হাজার বছরের চেষ্টা সাধনা দ্বারা অর্জিত সভ্যতা-সংস্কৃতিকে এবং ন্যায়নীতি ও অনুপম আদর্শকে স্থায়ী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। এ সব ছিল তাদের মানবতার প্রতি দরদ ও ভালবাসা, সঠিক 'রাহনুমায়ী' ও মানবতার মুক্তির জন্য ব্যাকুলতার ফসল।

ইসলামের কালজয়ী বিশেষত্ব ঃ

এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত বাস্তবতা এবং এ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। আর তাহল, সকল পুরাতন ধর্ম বিশ্বমানবতার উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সহযোগিতার সাথী হয়েছিল। তাদের সকল সমস্যার ক্ষেত্রে সঠিক সমাধান দিয়েছিল এমন যার উপকার কখনো ভোলার নয়। ঐ সব ধর্ম আজকালের বিবর্তনে যাঁতাপিষ্ট হয়ে স্বীয় শক্তি ও সামর্থ হারিয়ে ফেলেছে। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, সেগুলোর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে গেছে। ঐ সকল প্রদীপের তেল শেষ হয়ে গেছে এবং পলতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন তার মাঝে মানবতার মুক্তির পথ দেখাবার যোগ্যতা নেই। ঐ সব ধর্মগুলো জীবনীশক্তি ও উদ্যমহীনতার কারণে বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির এ শক্তিশালী তুফান মুকাবেলা করার শক্তি-সামর্থ হারিয়ে ফেলেছে। ঐসব ধর্মের পতাকাবাহীদেরও আজ ধর্মের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেছে। কারণ এসব ধর্ম এ যুগের চাহিদা মিটাবার যোগ্যতা রাখে না এবং এর অনুসারীদের মাঝে উদ্দীপ্ত ঈমান, আত্মোৎসর্গের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। এসব ধর্মগুলো আধুনিক সভ্যতা ও তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের মত অকেজো হয়ে আছে। অধিকাংশ সনাতন ধর্ম বরং সকল প্রাচীন ধর্ম পাশ্চাত্যের বস্তুবাদের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। আর এগুলোর অনুসারীরা এ

বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে যে, বস্তুবাদ মানব জীবনের জন্য ক্ষতির কারণ নয় বরং বস্তুবাদই হল বিশ্ব মানবতার আখেরী ঠিকানা।

কিন্তু এ নাজুক মুহূর্তে এখনো একটি ধর্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, যা জীবিত ও উজ্জীবিতকারী, যা সত্যের পতাকাবাহী ও বাস্তববাদী, পুতঃ ও পবিত্র এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত। এর প্রতিটি অনুসারীর বিশ্বাস যে, এ বিশ্বধরার প্রতিটি বস্তুর হিসাব গ্রহণ করা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সঠিক অস্তিত্ব প্রদান করা, মানবতাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং তার ভাল-মন্দের মুহাসাবা করার দায়িত্বশীল একমাত্র তারাই এবং তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এদিক থেকে এ ধর্ম চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

১। তার কাছে এমন এক মহাগ্রন্থ রয়েছে যা জীবনী শক্তিপূর্ণ মানবতার সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও তার সঠিক নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম। এ পবিত্র গ্রন্থ অসংখ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা বুকে ধারণ করে রেখেছে। এ মহাগ্রন্থ আক্বল ও বুদ্ধিমত্তা, উদ্যমতাপূর্ণ মানবতার এমন এক সম্পদ যা শেষ হবার নয়। এমন সুপেয় ঝর্ণাধারা যা শুষ্ক হবার নয়। তার প্রবহমান জীবনীশক্তি কখনো মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নয়। এ মহাগ্রন্থ মানবজীবনে এক মহৎ বিপ্লব সাধন করেছে। এখনো তার মাঝে পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে যে, এ মহাগ্রন্থ পুনরায় মানবজীবনে এক নতুন রূহ, এক নতুন নেতৃত্ব এবং নব উদ্যমতা ও তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

২। এ উম্মতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তাদের কাছে রয়েছে প্রিয়নবী (সাঃ) গৌরবময় সীরাত। সীরাতে রাসূল (সাঃ) হল বিশ্ব মানবতার জন্য সুন্দরতম ও আলোকময় বস্তু। এ সীরাত ও আদর্শ হল মানব জীবনের আলোকদীপ্ত অধ্যায়, যা মানবতার সঠিক মর্যাদা ও দায়িত্ব কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে তা পুনরুদ্ধার করার আহ্বান জানায়। এ সীরাত গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সক্ষম হতে পারে এবং অন্য সবকিছুর তুলনায় সে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় এক অনুভূতি তার মাঝে সৃষ্টি হয়। এটা এমন এক সৌন্দর্যবোধ যার মাঝে সামান্য সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও কামালিয়াতের ন্যূনতম মহব্বত রয়েছে সে প্রিয়নবী (সাঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে গৌরবময় মনে না করে পারবে না। তার তামান্না ও সাধনাই হবে যে, সে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর অনুসরণ করে মর্যাদার শিখরে উন্নীত হয়ে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে শক্তি, আত্মতৃপ্তি, পবিত্রতা ও বুলন্দ আখলাকের নমুনা পেশ করতে সক্ষম হবে। তার মাধ্যমে মানুষের আক্বল ও বুদ্ধির বন্ধাত্ব দূর হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। এ সৌন্দর্য ও পূর্ণতার পুণ্যময় বস্তু সর্বত্র বিরাজমান এবং কালের বিবর্তন তার কোন ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়নি।

(৩) মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল ইসলামী শরীয়তের সংরক্ষিত এক বিরাট ভাণ্ডার। এ বিশাল ভাণ্ডার প্রিয়নবী (সাঃ) যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন এখনও তা কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই মৌলিক উসুল ও উৎসসহ বিদ্যমান রয়েছে।

এ শরীয়ত ফিকহী যোগ্যতায় পরিপূর্ণ এবং পুরাতন ও আধুনিকতার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ এবং যার অতীতও গৌরবময় এ ফিকাহশাস্ত্র বর্তমানের সকল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান দিতে প্রস্তুত এবং ভবিষ্যতেও অটল অবিচল থাকবে। ইসলামী শরীয়তের কাছে রয়েছে এমন বিজ্ঞানসম্মত চূড়ান্ত মূলনীতি যার উপর ভিত্তি করে একটি কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা, একটি মানবদরদী সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে।

(৪) ইসলামের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, মুসলমানদের মাঝে এখনও পূর্ণ ধর্মীয় অনুভূতি ও প্রভাব রয়েছে। তাদের ঈমানী দুর্বলতা ও বিভিন্ন অপরাধের পরেও ইসলামের প্রভাব তাদের দিল ও দেমাগের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। তারা আজও যেকোন মুখলিছ ইসলাম প্রচারকের সামনে নিজেকে পেশ করতে এবং ইসলামের জন্য জীবনোৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এটা শক্তি ও অনুভূতির এমন এক সুন্দর দিক যা থেকে পশ্চিমা বিশ্ব রিক্তহস্ত। ইসলামের এ সুন্দরতম দিকের আন্দাজ ঐ ব্যক্তিই করতে সক্ষম, দাওয়াত ও ইসলামী জাগরণের ক্ষেত্রে যার সামান্য কাজ করার সুযোগ হয়েছে।

শিক্ষিত যুবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ইউরোপ ও আমেরিকাতে অবস্থানকারী এবং সেখানে জ্ঞান অন্বেষণকারী যুবদল সকলেই এ বিশাল মুসলিম উম্মাহর সদস্য ও ইসলামের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। তারা সকলেই এ বিশাল পরিবারের সদস্য এবং প্রত্যেকেই বিশাল খান্দানী মীরাসের ওয়ারিশ। খান্দান বলতে ঐ অর্থ নয় যা অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা খান্দানী সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে বুঝিয়েছে এবং মীরাছ বলতে ঐ অর্থও নয় যা প্রাচ্যবিদরা ও জ্ঞানশূন্য গবেষকগণ বুঝাবার চেষ্টা করেছে। তারা এ বিষয়ে (LEGA OF ISLAM) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। বরং খান্দানের ঐ অর্থ উদ্দেশ্য যা জ্ঞানীরা বর্ণনা করেছে। এ অর্থে খান্দান অত্যন্ত বিশাল ও গভীর। আর তা হল পরিবারের সদস্য, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের জন্য খেদমত ও কুরবানী, ত্যাগ ও সাধনা করে একটি মর্যাদার আসন দখল করেছে।

ইসলামকে নতুনভাবে জানার প্রয়োজন ঃ

প্রিয় শিক্ষিত যুবশ্রেণী ঃ

আপনারা আবার নতুন করে ইসলাম জানার চেষ্টা করুন। ইসলামের বিশেষত্ব ও তার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন, যা আমি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি। আপনারা নতুনভাবে, নতুনপন্থায় এবং নতুন আঙ্গিকে ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করুন। ইসলাম গবেষণার ক্ষেত্রে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন। আপনারা কুরআন মাজীদকে অন্যান্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আলোতে নয় নিজেদের দিল ও দেমাগের চিন্তা দ্বারা অধ্যয়ন করুন। কুরআন মাজিদকে বুঝার ক্ষেত্রে নিজের চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগান। কুরআন মাজিদকে এভাবে তেলাওয়াত করুন যে, তা পূর্ববর্তী কোন ধর্মগ্রন্থ নয় বরং বর্তমান যুগে নাযীলকৃত একটি মহাগ্রন্থ। বরং আপনার উপর নাযীলকৃত একটি গ্রন্থ এবং আপনাকে সম্বন্ধ করে বলা হচ্ছে। আপনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সীরাত ও হাদীস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় করুন। প্রিয় নবী (সাঃ) এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত মুহাব্বত সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। আপনার এ সম্পর্ক ও মুহাব্বত, অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অনুকরণ ও অনুসরণের মূলনীতি অনুপাতে হওয়া প্রয়োজন।

আপনারা ইসলামের প্রতিনিধি ঃ

এরপর আপনাদের উপর ফরজ ও জরুরি কর্তব্য হল, আপনারা ইউরোপে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করবেন। ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে করবেন। ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরবেন, ইসলামী ফরজ সমূহ, আখলাক চরিত্র ও ইসলামী রীতি-নীতিকে হেফাজত করবেন। কারণ, আপনারা এমন এক ধর্মের প্রতিনিধি যা সর্বশেষ ধর্ম এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার জন্য অধিক উপযুক্ত।

উত্তম দৃষ্টান্ত কায়েম করুন!

আপনাদেরকে আপনার বন্ধু-বান্ধব ও মুসলিম যুবকদের সামনে অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। কারণ, তারা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে লজ্জাবোধ করে। যারা মুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও আরব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে এমন মুসলিম যুবক রয়েছে যারা ইসলামের বহিঃপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখে তাদের জন্যও আপনারা নজীর স্থাপন করুন। আর এ কারণে আপনাদের জন্য অবশ্যই সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে। আপনারা পবিত্র

ইসলামী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হন। কারণ, এর মাঝে রয়েছে সততা ও খোদাভীতি, সত্যবাদীতা ও আমানতদারী, জিকির ও এবাদত, আল্লাহর রেজামন্দী ও অল্পেতুষ্টি, উদ্যমতা ও কর্মশক্তি, আধ্যাত্মিকতা ও আবেগ-অনুভূতি। আপনারা আপনাদের বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষকমণ্ডলী ও প্রতিবেশীদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারেন। কারণ, ইতিহাস সাক্ষী এ পদ্ধতিতেই ইসলাম অজস্র জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে স্বীয় ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করেছে। আর কোন প্রকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সামরিক মহড়া ছাড়াই অসংখ্য দেশ ও জাতি-গোষ্ঠী ইসলাম নামক জীবন প্রদীপকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

হতে পারে আপনি কোন কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র বা কোন কল-কারখানার শ্রমিক, কোন অফিসের কর্মচারী, এ দিক থেকে আপনার অবস্থান ক্ষুদ্র ও নগণ্য, কিন্তু আপনার মুসলিম অস্তিত্ব, আপনার আক্বীদা-বিশ্বাস, আপনার দাওয়াত ও পয়গাম অনেক মর্যাদাময়। আপনি যে শিক্ষকের কাছ থেকে যেকোন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে থাকুন না কেন আপনার উপর কিছু দাবী ও অধিকার রয়েছে। আর ইসলামই সর্বপ্রথম অন্যের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে শিক্ষা দেয়। এ ক্ষেত্রে তাদের ইসলাম বুঝার জন্য আপনার ব্যক্তিত্বের সঠিক প্রতিফলন ঘটা প্রয়োজন। কারণ, আপনি তাদের সামনে হাদী ও মুর্শিদের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

দুর্লোভ ও সুবর্ণ সুযোগ ঃ

এ মুহূর্তে আপনি আপনার গুরুত্ব ও মূল্য অনুধাবন করুন। আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করুন এবং তাদের অধিকার আদায় করুন। আমি আবার আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ইউরোপে আপনার অবস্থান এটি একটি অত্যন্ত দুর্লোভ ও সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগকে আপনার কাজে লাগানো একান্ত জরুরি। এর মাধ্যমে ইসলাম ও মানবতার কল্যাণ সাধন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এসব দেশে আপনার অবস্থান আপনার ঈমানকে শক্তিশালী করে তুলবে ইসলামের প্রতি আপনাকে আস্থাশীল করে তুলবে এবং আপনার জন্য গৌরবের বিষয় হল এই যে, আপনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রার নতুন দ্বার উন্মোচন হবে।

আপনার কর্মতৎপরতার দ্বারা এমন এক দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটবে, যারা ইসলামের মত মূল্যবান নিয়ামত থেকে ছিল মাহরূম, যে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা নবুয়তী ব্যবস্থার পরিপন্থী ও আসমানী পয়গাম থেকে ভিন্ন। যে দেশের অধিবাসীরা উন্নত আখলাক চরিত্র ও রূহানীয়ত শূন্য। সম্ভবত এ দেশে আপনার অবস্থান এ শূন্যতা পুরা করতে সক্ষম হবে।

বিশ্বের বর্তমান অস্থিরতা ও মুক্তির পথ

দিলভাঙ্গা অভিজ্ঞতা ঃ

বর্তমান বিশ্ব বড় নির্দয়ভাবে বিভক্ত হয়ে আছে। প্রাচীনকালে রাজা-বাদশারা দেশ বিভক্ত করত। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির মাধ্যমে দেশ-জাতি-গোষ্ঠী ও পাড়া-মহল্লা বিভক্ত হয়ে আছে। ধর্মের রূপে এত ফেৎনা ছিল না যত ফেৎনা আজ সভ্যসমাজে ও গণতন্ত্রের যুগে রয়েছে। রাজনৈতিক প্লাটফর্ম আজকের বিশ্বে মানুষকে বিভক্ত করার জন্য এবং নিজেদের দলে ভিড়ানোর জন্য বিশেষভাবে কাজ করছে। তবে যদি এখনও নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ডাকা হয় তাহলে এখনও তারা সে আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত। এখনও মানুষকে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ছাড়া একত্রিত করা সম্ভব। আর এ কারণেই আমরা আপনাকে শুধুমাত্র মানুষের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলাম এবং আপনারা এ দাওয়াতে সাড়া দেবার কারণে আমি খুশি ব্যক্ত করছি।

মানুষ সাধারণত নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। যে সব জিনিসের দ্বারা বারংবার উপকৃত হতে দেখে তাকেই স্বাভাবিক নিয়ম মনে করে থাকে। বর্তমানে স্বার্থের জন্য, একত্রিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা আমার উপর আস্থা রাখুন আমরা কোন রাজনৈতিক দলের লাউডস্পিকার বা মুখপাত্র নয়। আমাদের সামনে শুধুমাত্র মানুষের সমস্যাগুলো রয়েছে এবং এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আমরা একত্রিত হয়েছি।

নেতৃত্বের নেশা ঃ

বর্তমান যুগের মানুষ মূল সমস্যা থেকে চোখবন্ধ করে বলে থাকে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে যদি তা আমার নেতৃত্বে হয়ে থাকে। যা কিছু হবে সব আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার নেতৃত্বে হতে হবে। নীতিহীনতা, অসামাজিকতা, কালোবাজারী, মাল জমা করার নেশা সবকিছুই ঠিক আছে। কিন্তু দখলদারিত্ব আমার হাতে তুলে দিতে হবে, তাহলে আর কোন সমস্যা নেই। আজ প্রত্যেকের দিলের আকাঙ্ক্ষা ও মনের চাহিদা এটাই এবং যখনই কারো হাতে ক্ষমতা এসেছে সেই লুট-পাট ও দুর্নীতির সাবেক স্বর্গরাজ্য বহাল রেখেছে। কিছু হেরফের করে আগের কাহিনী মঞ্চস্থ হয়েছে। দুর্নীতি ও কালোবাজারীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। কাউকে বলতে দেখা যায় না যে, এসব যা হচ্ছে

তা হওয়া উচিত নয়। বরং সবার কথা একটাই, আর তা হল, যা কিছু হচ্ছে তা আমার নেতৃত্বে এবং আমার পৃষ্ঠপোষকতায় হওয়া উচিত। কারখানা উল্টো চলছে এতে কারো প্রশ্ন নেই, সকল রাগ ও আপত্তি তো এখানেই যে আমার ছত্রছায়ায় তা হল না কেন?

বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ

ঘটে যাওয়া বিশ্বযুদ্ধগুলো এ মূলনীতির ভিত্তিতেই সংঘটিত হয়েছিল। ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানি, রাশিয়া, আমেরিকা ও অন্য সকল দেশ ঐ মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা সবাই কথার আড়ালে এ দাবী উত্থাপন করেছিল যে, বিশ্বায়নের নেতৃত্ব অন্যের হাতে কেন? অন্য জাতি কেন সব সময় বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন থাকবে? বিশ্ব মানবতার প্রতি দরদ ও ভালবাসা নিয়ে কেউ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে, দুনিয়াতে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও খোদাদ্রোহী লোপ পাবে, জুলুম-অত্যাচারের পালা শেষ হয়ে যাবে, এ লক্ষ উদ্দেশ্য কেউ ধারণ করেনি। আমেরিকা, ইউরোপ, জার্মান ও রাশিয়া কারো এ নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। ভাল-মন্দ, জুলুম-অত্যাচার, ন্যায়-ইনসাফ, হক ও বাতিল এসব নিয়ে তাদের কোন আলোচনা ছিল না। তারা কখনও চিন্তা করেনি যে, তারা এ যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বকে একটি সঠিক জীবনব্যবস্থা দিয়ে বিশ্বমানবতার মেধা উপহার দিবে। বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের গঙ্গা প্রবাহিত করা এবং দেশ-বিদেশের খাজানা দ্বারা উপকৃত হওয়া।

মানবতার দুশমন ঃ

তারা দুনিয়ার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব (MONO POLY) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করেছিল। তাদের সকলের একই জীবনব্যবস্থার উপর ঈমান ছিল। আর তা হল কিভাবে তারা দুনিয়াকে পদদলিত করে, মানুষের লাশের উপর আরাম-আয়েশের রংমহল তৈরি করবে। বনী আদমের লাশের স্তূপের উপর নিজেদের প্রভুত্বের পতাকা উড়াবে। তারা সবাই ছিল ক্ষুধার্ত হায়েনা, দৌলতের নেশায় মত্ত, খাহেসাতের গোলাম, মাদকাসক্ত ও বাজিগর, আল্লাহ ভোলা এবং সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। তাদের দিল মানবতার প্রতি মায়া-মমতাবোধ থেকে ছিল খালি, বনী আদমের ব্যাপারে ব্যথা ও বেদনামুক্ত। আর আজকের দেশ-জাতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি সব চলছে তাদের

মতাদর্শের উপর। সকলের একই মানসিকতা। আর তা হল, আমি এবং আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার আস্থাভাজন ও দলীয় নেতা-কর্মীরা আরাম-আয়েশের জীবন যাপন করবে। তারা বর্তমান অবস্থাকে (ACCEPT) করতে পারে। তাদের বর্তমান অবস্থার সাথে কোন বিরোধ নেই। তাদের বিরোধ শুধু ঐ লোকদের সাথে যাদের হাতে রয়েছে ক্ষমতার চাবি-কাঠি। তারা দুনিয়ার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায় না। তারা চায় কেবল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের হাত পরিবর্তন করতে। তাদের চেষ্টার মূলমন্ত্র হল, নেতৃত্বের আসন থেকে অন্যকে সরিয়ে সে জায়গা নিজেরা দখল করা। আমাদের দেশে বিভিন্ন ইলেকশন হয়ে থাকে। এম,পি, নির্বাচন, মেয়র নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন। এসব নির্বাচনে নতুন নতুন লোক ও নতুন নতুন নেতৃত্ব এসে থাকে। কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন জীবনপদ্ধতি, মানব সেবার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে থাকে কি? নতুন নতুন কমিশন ও নতুন নতুন বোর্ড দুর্নীতির আখড়া ভাঙতে সক্ষম বা নির্ভয়ে মানবতার সেবা করতে সক্ষম হয়েছে কি? বরং আমরা জানি তারা সকলেই একই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, একই জীবন পদ্ধতি গ্রহণকারী এবং একই মানসিকতা নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী। আর এ কারণেই এর পরিণতি হল বিশ্বমানবতার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। জীবনের বিগাড় ও সমাজের খারাবী যে স্তরে ছিল তা থেকে অধিক অধঃপতন সাধিত হয়েছে, উন্নত হয়নি।

জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই ভুল ঃ

অন্যদিকে আম্বিয়াদের শিক্ষা হল, জীবনের এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুল। তাই এ ভুলকে মূলোৎপাটন করে জীবনকে নতুনভাবে প্রস্তুত করা, জীবনকে নতুন করে সজ্জিত করা, এর দৃষ্টান্ত হল, কোন ব্যক্তি রেডিমেট শেরওয়ানী ক্রয় করল। কিন্তু তা তার দেহে ফিট না হওয়াতে এদিক সেদিক থেকে কেটে ফিট করার মধ্যে কালক্ষেপণ করতে লাগল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নবীদের শিক্ষা হল, এ ব্যক্তি ভুলের পিছনে সময় নষ্ট করছে। যতক্ষণ সে এ ভুলের ভিতর কালক্ষেপণ করবে তা থেকে উত্তম হল তা বাদ দিয়ে নতুনভাবে তৈরি কর।

রাজনৈতিক মতাদর্শ ঃ

আজ গোটা বিশ্ব মানুষকে তার খাহেশাত পূর্ণ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন মনে করে থাকে। এ ভুল মতাদর্শ পরিত্যাগ করার জন্য জনমত সৃষ্টি করার পরিবর্তে আজকের সকল রাজনৈতিক দল তাদের সকল প্রকার সুযোগ সরবরাহ করছে। খাহেশাত পূর্ণ করার সুযোগ, বদআখলাকী ও নীতিহীন কার্যকলাপ পরিচালনা

করার সুযোগ এবং ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় বলে থাকে যদি ক্ষমতা আমাদের হাতে আসে তাহলে আমরা জনগণের সব ধরনের খাহেশাত পূরণ করার সহযোগিতা ও স্বাধীনতা প্রদান করব। তাদের উন্নতি, অগ্রগতি ও আরাম-আয়েশের সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করব। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের খাহেশাত পূর্ণ করতে এবং সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করতে চাও তাহলে আমাদের ভোট দাও। আজ প্রত্যেক দলের শ্লোগান–আমরা ক্ষমতায় গেলে তোমাদের ভোগ বিলাসিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেব, তোমাদের উন্নত জীবনের ব্যবস্থা করব। মোটকথা সকলেই যেন মিষ্টি দ্রব্যের মাধ্যমে শিশুদের অভ্যাস নষ্ট করতে চাই। তারা যেন সবাইকে নির্বোধ শিশু মনে করে মিষ্টান্ন দ্রব্যের মাধ্যমে ভুলিয়ে রাখতে চায়। আজকের সরকার ও রাজনৈতিক দল জনসাধারণের খাহেশাতের পালে হাওয়া দিয়ে তাদের অভ্যাসকে বিগড়ে দিচ্ছে। বর্তমানে মানুষের স্বভাব হল, যতই তাকে দেয়া হোক সে আরো অধিকের ভিখারী, যদি কোন ফ্লিম বের হয় তো তার নেশা আগের চেয়ে বেড়ে যায়, তা থেকে আরো বেশি উদ্দীপনাময় (EXCITEMENT) ফ্লিম দেখতে চাই, আরো বেশি নগ্ন দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়। বর্তমান সরকার মানুষের খাহেশাতের উপর লাগাম আরোপ না করে তাদের খাহেশাত ও চাহিদা মত সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে।

আম্বিয়াদের পদ্ধতি ঃ

জনসাধারণের মাঝে খাহেশাতের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া আম্বিয়াদের পদ্ধতি নয়। বরং তাদের পদ্ধতি হল, খাহেশাতের মাঝে স্থিতিশীলতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। তাদের বক্তব্য হল, প্রত্যেক ব্যক্তির খাহেশাত পুরা করার চেষ্টা করা নিয়ম বহির্ভূত কাজ। নবীদের কথা হল, জনসাধারণের লাগামহীন খাহেশাত ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণ। তাই তাকে মনচাহি জিন্দেগী হতে ফিরিয়ে আনা উচিত। শিশুর মন খারাপ হোক, সে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করুক, গড়াগড়ি দিক। এসবকিছু সহ্য করে তাকে সুপথে তুলে আনা প্রয়োজন। খাহেশাতের উপর পাবন্দি আরোপ না করে তার সমর্থন দেওয়া একটি ভুল দর্শন। আর যখন খাহেশাতের লাগামহীন ঘোড়ার ধ্বংসাত্মক পরিণতি দেখা দিবে তখন আফসোস ও অভিযোগ করা বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

লাগামহীন খেল-তামাশা ঃ

রাজনৈতিক নেতাদের জীবন পদ্ধতিই হল ভুল। কারণ, যদি তাদের জীবন পদ্ধতি মেনে নেওয়া হয় তাহলে লাগামহীন জোরালো ঘোড়া মানুষের ক্ষেত খেয়ে যাবে। আজকের সকল রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে লাগামহীন ঘোড়া বানাতে চায়। আজকে চারিদিকে লাগামহীন ঘোড়ার প্রতিযোগিতা চলছে। তাদের সামনে মানুষের আত্মার কোন মূল্য নেই। মানুষের প্রতি সহানুভূতির কোন আগ্রহ নেই। ইউরোপ ও আমেরিকা মানব অধিকার, সাম্য ও সম্প্রীতির কথা বলে থাকে। কিন্তু তাদের মানব অধিকার, সাম্য ও সম্প্রীতির অর্থ ও পরিধি কি তা আমাদের জানা। তারা প্রকাশ্যে মানবতার কথা বলে কিন্তু ভিতরে তো নেশার ভূত চেপে বসে আছে। সে সব দেশে জুলুম অত্যাচারের অভিনব পদ্ধতি রয়েছে।

নেতৃত্বের যোগ্য কে?

আমি বলতে চাই, জীবনের রাস্তা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হতে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর একীন পয়দা না হবে আত্মশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এছাড়া আমরা জালেমকে জুলুম থেকে বিরত রাখতে এবং মানব দরদী বলতে সক্ষম হব না। আমি কোন প্রকার লেখাপড়া না করে সরাসরি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এমন নয়। বরং আমি গবেষণার আলোকে বলতে চাই যে, যতক্ষণ আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করব ততক্ষণ মানুষের প্রকৃত রূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হব না। তাই নিজের ভিতর থেকে পদমর্যাদার লোভ, ধন-সম্পদের মোহ বের করুন, অন্যের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী, নিঃস্বার্থভাবে নিঃশেষ হবার মানসিকতা তৈরি করুন। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন– দায়িত্ব ভার তো সে পাবে যে ব্যক্তি এর জন্য লালায়িত নয়। দায়িত্ব পাবার এটাই ছিল মাপকাঠি। কিন্তু আজ এর বিপরীত। নির্লজ্জের মত নিজের প্রসংশার গীত গেয়ে হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর বৈশিষ্ট্য ঃ

পক্ষান্তরে সাহাবা (রাঃ) দায়িত্বভার গ্রহণ করা থেকে পলায়ন করতেন। হযরত উমর (রাঃ) তো মাফ চেয়ে বলতেন, আমাকে ক্ষমতার বোঝা বহন করা থেকে মুক্তি দাও। কিন্তু তাকে বাধ্য করা হত এই বলে যে, আপনি গ্রহণ না করলে রাষ্ট্র কে সামাল দিবে? তারা যতদিন দায়িত্ব পালন করতেন দায়িত্বকে জিম্মাদারী ও বোঝা মনে করতেন। আর যখন দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতেন তখন

তারা অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। হযরত খালেদ (রাঃ)-কে যখন প্রধান সেনাপতি (COMANDER IN CHIEF) নিযুক্ত করা হলো তখন চতুর্দিকে তাঁর ডংকা বাজতে লাগল। ইত্যবসরে মদীনা থেকে ক্ষুদ্র একটি কাগজের মাধ্যমে তাকে বরখাস্ত করে হযরত আবু ওবাইদাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু এতে তাঁর সামান্য মনঃকষ্ট পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তিনি অত্যন্ত প্রশস্ত চিত্তে বলেছিলেন–যদি আমি এ কাজকে এবাদত মনে করে করতে থাকি তাহলে আজো তা করতে কার্পণ্যবোধ করব না। আর যদি ওমর (রাঃ)-এর জন্য করে থাকি তাহলে তা থেকে দূরে সরে যাব। অতঃপর মানুষ লক্ষ্য করেছে যে, তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন এবং তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

ক্ষমতার নেশা আর দৌলতের ভূত ঃ

আজ যদি কোন রাজনৈতিক দলের কোন নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় প্রথমে সে দল থেকে স্বেচ্ছায় বের হবার পরিবর্তে বেঁকে বসে। বিভিন্ন তৎপরতা শুরু করে। আর যদি নিতান্তই বের হতেই হয় তবে নতুন এক দলের জন্ম দেয়। এর কারণ কি? এর কারণ হল ক্ষমতার নেশা, দৌলতের তামান্না, বড়ত্বের চিন্তা-চেতনা দিল ও দেমাগকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। সুতরাং যতক্ষণ বর্তমান দেহের আকৃতি পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ এর পরিশুদ্ধি অসম্ভব। আমি আপনাদেরকে জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বলে দিতে চাই। আর তা হল, আল্লাহর ভয় ও তাকে সন্তুষ্ট করার আগ্রহ নিজের মাঝে পয়দা করা, রূহানী ও আখলাকী জীবন গঠন করা, আর জীবন থেকে মজা লুটবার যে মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে তা পরিত্যাগ করা।

জরুরত ও খাহেশাত ঃ

মানুষের জরুরত ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ফিরিস্তি খুব বেশি লম্বা নয়। তবে তার অপ্রয়োজনীয় চাহিদার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। কারণ সকলেই তাদের জবিনের ভিত্তি ও মাকসুদ বানিয়েছে ভোগ-বিলাসিতাকে। প্রত্যেকেই পেট ও খাহেশাতকে নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে। কেউ আল্লাহকে মানতে রাজি নয় এবং তার কর্তৃত্বকে স্বীকার করতেও প্রস্তুত নয়। মানুষের এ অবস্থা দেখে মানুষকে উন্নত প্রাণী বলে আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হবে না। আর এ কারণেই সকলেই অধিক থেকে অধিক খাহেশাত পূরণে ব্যস্ত। আর এটাই হল সকল ফ্যাসাদের মূল। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত এ মূলনীতি বিরাজমান থাকবে ততদিন

হাজার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেও অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। একটি দেশ বা শহর তো অনেক দূরের কথা, একটি গ্রাম বা একটি মহল্লার অবস্থা পরিবর্তন করাও অসম্ভব।

একটি আজব দর্শন ঃ

বর্তমানে মানব সদস্য এবং সমাজের সকল স্তর খারাপ হয়ে গেছে। ভুলনীতির উপর তাদের লালন-পালন হচ্ছে। আর নষ্ট দর্শনের ভিত্তিতেই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। ফলে আজকের গোটা সমাজ ব্যবস্থা বিগাড়ের শিকার, ফলে এর ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। কারণ দল, জামাত ও সমাজ গঠিত হয় দল, জামাত ও সমাজের সদস্য দ্বারা। আর তাই ব্যক্তি বা সদস্য পরিশুদ্ধ ও কল্যাণকর না হয় তাহলে দল ও দলীয় কার্যক্রম, সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে কল্যাণকর হতে পারে? বর্তমানে সকলের মানসিক অবস্থা হল, যদি ব্যক্তি সংশোধনের কথা বলা হয় তাহলে সকলেই নারাজ এবং এ বিষয়টি এড়িয়ে যেতে প্রস্তুত। কারণ সকলেই এ ভ্রান্ত ধারণাতে বিভোর যে, সামাজিক ব্যবস্থাপনার মাঝে ব্যক্তির এ ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিকভাবেই ঠিক হয়ে যাবে।

এ এক আজব দর্শন। কারণ, ইট যখন ভাটা থেকে পুড়িয়ে বের করা হয় তখন কেউ যদি বলে, এটাতো হলুদ ইট, পুরোপুরি পুড়েনি। এখনো কাঁচা রয়ে গেছে। এ ইট বিল্ডিংয়ের ভার বহন করতে সক্ষম নয়। কিন্তু কেউ যদি এর উত্তরে বলে– বিল্ডিং তৈরি হয়ে যাক, ইটগুলো স্বাভাবিকভাবেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, খারাপ ও অপরিপক্ক বস্তু দ্বারা একটি মজবুত ও সুন্দর-সুচারু প্রাসাদ নির্মাণ করা কি সম্ভব? ত্রুটিযুক্ত পদার্থ দ্বারা একটি সুন্দর বাড়ি কি নির্মাণ করা সম্ভব? ঘুণে খাওয়া পচা তখতা দ্বারা কি একটি মজবুত জাহাজ তৈরি সম্ভব? যেখানে ইউনিট (units) খারাপ, মাল-মসলা (Material) খারাপ সেখানে একটি দুর্নীতিমুক্ত দল, সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করা আদৌ সম্ভব নয়। আজকে সারা বিশ্বের হালচিত্র এটাই। কিন্তু অবস্থা কেউ পর্যবেক্ষণ করে না। আর এর পরিণতি দেখে সবাই হাতাশা ব্যক্ত করে। কিন্তু এটাই জাতির বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

পক্ষান্তরে আম্বিয়া (আঃ) ঘুণমুক্ত তখতা প্রস্তুত করেন, ইউনিট তৈরি করেন, পক্ত ইট তৈরি করেন। ফলে এর পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী ও কল্যাণকর হয়।

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে আল্লাহর জাতের প্রতি একীন ও বিশ্বাস, আখলাক ও নৈতিকতার, শিক্ষা

দেবার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির তরবিয়তের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সকল প্রতিষ্ঠান থেকে তরবিয়তহীন ব্যক্তি দলে দলে বের হচ্ছে। আজকের ছাত্ররা সব ধরনের নীতিহীন কাজে অভ্যস্ত। কারণ তাদের মন-সানসিকতা পরিবর্তন করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। আজকে সিটি কর্পোরেশনে যারা দায়িত্ব পালন করছে, ডিস্ট্রিক বোর্ডে যারা চাকরি করছে, দেশের সকল দায়িত্ব পালন করছে তারা ঐসব তরবিয়তহীন নীতি বর্জিত মানুষ। এদের হাতেই মানব জীবনের সকল চাকিকাঠি। ঐ সব নীতিহীন মানুষগুলো আসলে মানুষ নয়, মানুষ আকৃতির হায়েনা।

খোদা ভীতির গুরুত্ব ঃ

সত্য প্রকাশিত হয়েই যায়, যদিও তা গোপন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ভিতরের অবস্থা বের হয়ে পড়ে যদিও তা লুকানোর চেষ্টা করা হোক। কথিত আছে, একবার এক গাধা সিংহের চামড়া পরিধান করে বের হয়েছিল। কিন্তু যখন বিপদ দেখে ঘাবড়ে গেল তখন সে নিজের ডাক ডাকতে লাগল। বর্তমানে সর্বত্র এ ঘটনার পুনারাবৃত্তি হচ্ছে। ভিতরের কথা বের হয়ে আসছে।

আপনারা অনেকেই সমাজের অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আপনাদের নিষ্ঠা ও সততার কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু কখনো কি আপনারা দলের শিকড় পর্যায় থেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। লোক তো দলের নেতৃত্বের পিছনে ছুটছে। কিন্তু যা করণীয় ছিল তা হল, মানুষের দিলে মানবতার প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ জাগ্রত করা এবং খোদাভীতির মনমানসিকতা গড়ে তোলা।

এটা কুদরতী বাগান, দোকান নয় ঃ

বর্তমানে আল্লাহ তায়ালার কুদরতীর বাগানকে দোকান বা বিপণী কেন্দ্র মনে করা হচ্ছে। একজন অন্যজনকে খরিদ্দার মনে করে তার সাথে লেন-দেন করে থাকে। এ ব্যবসায়িক মানসিকতা বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে অস্থিরতা, কোথাও মালিক-শ্রমিকদের সংঘর্ষ; এ সবের কারণ কি? এ সব ঐ ব্যবসায়িক মানসিকতার পরিণতি।

পক্ষান্তরে নবীগণের শিক্ষা হল প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত তার উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবে আর

অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও আন্তরিকতার পরিচয় দিবে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন এটাই যে, আপনারা প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব পালন করুন এবং সদাচরণ করুন। তাহলে পরিবেশ বদলে যাবে। জীবনের স্বাদ পাওয়া যাবে, আজ সর্বত্র লুট-পাট চলছে। কারণ সবার দৃষ্টি বিলাসিতার দিকে, কেউ তার সীমাবদ্ধতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে রাজি নয়।

সকল পার্টির অস্তিত্ব থেকেও আমাদের অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ঃ

আমাদের এ পয়গামকে সকল পাটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং আমাদের অস্তিত্বকে অন্য সকল পার্টি থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হই তাহলে বিশ্বমানবতা সুরভীময় সৌরভে পরিণত হবে। আজকের বিশ্ব কন্টাকাকীর্ণ। কারণ মানবতার এ পল্লিতে কোথাও কোন মানুষ নেই। তাই আমরা বলতে চাই, মানবতার বসন্ত আন, মানবতাকে প্রস্ফুটিত করার চেষ্টা কর। কারণ মানবতার বাগানে আজ কাঁটা ও অখাদ্য ফল জন্ম নিচ্ছে। আপনারা মানবতার বাগানে সৌরভময় পুষ্প ও সুমিষ্ট ফল উৎপাদন করুন। আমরা আপনাদের রাজনীতিতে বা বিভিন্ন কাজে-কর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিকারী নয়; বরং আমরা বলতে চাই যে, আপনারা আপনাদের কাজের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার খোঁজ খবর নিন। আমরা এ ভ্রান্তনীতি ও ভ্রান্ত মানসিকতার বিরুদ্ধে একটি আওয়াজ উঠাতে চাই। হয়ত কারো অন্তরে, অনুভূতি সৃষ্টি হবে। এ কাজ নবীদের কাজ। আর নবুওয়াতী জিম্মাদারী, এ জিম্মাদারীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাদের।

অনেক কথা তো দেমাগে থেকে যায়, কোন কোন কথা পেটেই রয়ে যায়, আবার কোন কথা কাপড় ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে কিন্তু আল্লাহর একীন ও মুহাব্বত মানুষের দিলের মাঝে আত্মস্থ করে দেয়। ধর্ম মানুষের চোখের কুটা ও দিলের জ্বালা দূর করে। নবীদের কাজই হল মানুষের চোখের বিদ্ধ সুচ বের করে দেওয়া। তাদের মেহনতের বদৌলতে মানুষের দিলের জ্বালা বের করে প্রশান্তির শ্বাস নিতে সক্ষম হয়।

তুমিতো ইমাম ও দাঈ ইলাললাহ ঃ

আমি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে বলতে চাই যে, আপনারা নবীদের প্রতিনিধিত্ব লাভ করার পর এবং তাদের পয়গাম অন্যের কাছে পৌঁছাবার জিম্মাদারী লাভ করার পর এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হননি। এক্ষেত্রে আপনাদেরকে অপরাধী বলা যেতে পারে। আপনারা প্রকৃত মালিককে ছেড়ে নিকৃষ্ট মালিকের

এজেন্টে পরিণত হয়েছেন। আপনাদেরও ব্যবসায়িক মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে এবং প্রকৃত অর্থে আপনারা ব্যাপারী হয়ে গেছেন। অথচ আপনাদের অবস্থান ব্যাপারী ও চাকরিজীবীদের মত নয়। সর্বত্রই দাঈ ও ধর্মপ্রচারক হিসেবে আপনাদের আগমন, কিন্তু বর্তমানে আপনারা ধর্মপ্রচারকের গুণাগুণ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছেন। আপনারা যদি দাওয়াত ও মুহাব্বতের পয়গাম বুকে ধারণ করে রাখতেন তাহলে ইজ্জতের সাথে এবং সফলতা ও কামিয়াবীর সাথে জীবন যাপন করতেন।

সুতরাং আপনাদের সফলতা তো ঐ পথেই রয়ে গেছে। যদি আপনারা আপনাদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে, ভুলে য়াওয়া লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে আবার আঁকড়ে ধরেন তাহলে আপনারা আপনাদের অতীত ইজ্জত ও সফলতা ফিরে পেতে সক্ষম। দুনিয়ার কামিয়াবী ও সফলতা অর্জিত হয় নবীদের প্রদর্শিত পথে ও তাদের প্রদত্ত জিম্মাদারী আদায় করার মাধ্যমে।

আপনারা রাজনীতির ডামাডোল, দল ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব পরিহার করে বিভ্রান্তিময় জীবন পরিশুদ্ধি করার আপ্রাণ চেষ্টা করুন। ব্যক্তি স্বার্থ ও শুধুমাত্র বন্ধু-বান্ধবদের চিন্তা ফিকির পরিত্যাগ করে বিশ্ব মানবতার চিন্তা-ফিকির করুন। কারণ বিশ্ব মানবতা পরিশুদ্ধি ছাড়া বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসতে পারে না।

আধুনিক জ্ঞান অন্বেষণকারী মুসলিম যুবকদের প্রতি আহ্বান

একটি ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

আমি কোন ওলি নই, নবীও নই বা বুযুর্গ হবার দাবিদারও নই। ভবিষ্যদ্বাণী করার কোন আগ্রহও আমার নেই। তদুপরি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই। আর তা হল আপনাদের এই সমাবেশে এমন সব সৌভাগ্যময় যুবক রয়েছে যারা নিজের দেশের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে এবং রাষ্ট্রের বড় বড় দায়িত্ব পালন করবে। আপনারা এখানে জ্ঞান অন্বেষণ করছেন আর দেশের নেতৃত্বের আসনগুলো এবং রাষ্ট্রের সম্মানজনক পদমর্যাদাগুলো আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি আপনাদের আলোকোজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়দীপ্ত পেশানীর দাগ ও চিহ্নগুলো দেখে আপনাদের গৌরবময় ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি।

অতীতে যেকোন দেশের নেতৃত্ব অর্জনের জন্য, যে কোন দেশ ও জাতির ক্ষমতার মসনদ গ্রহণ করার জন্য পেশীশক্তি ও সমরশক্তির প্রয়োজন ছিল। বাদশাহ ইস্কান্দার, চেঙ্গিস খান ও হালাকু খান সমরাস্ত্রের মাধ্যমে বিশ্ব জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা পেশীশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বজয় ও বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য পেশীশক্তি ও সমরশক্তিই যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার। আজকের উন্নত বিশ্বের সকল রাষ্ট্র বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্ব গণতন্ত্রের যে ধারায় ধাবমান এবং যেসব সংকট ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা দেখে একথা বলতে হয় সে সব দেশের নেতৃত্ব ও দায়িত্বভার তারাই গ্রহণ করতে সক্ষম যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজি ভাষাতে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করার জন্য আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সবধরনের সাহায্য ও সযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। আর এ কারণেই আশা করা যাচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও বিশেষত্বের কারণে আপনারা দেশ ও জাতির নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবেন, রাষ্ট্রের মহৎ ও গুরুত্বপূণ দায়-দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশ ও জাতির খেদমত করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হবেন। এটা আপনাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। ঐসব দেশের ভাগ্য অনেকটা আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতেই নির্ভর করছে।

মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ঃ

আপনারা যেসব দেশ হতে এখানে জ্ঞানান্বেষণ করতে এসেছেন এবং আবার যেখানে ফিরে যাবেন সেসব দেশ দীর্ঘদিন যাবত মুসলিম বিশ্ব নামে পরিচিত এবং আজও এসব দেশ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত, আগামীদিনেও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ঐসব দেশ অত্যন্ত ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে ইসলাম অর্জন করেছিল। এজন্য ইসলাম তাদের অত্যন্ত প্রিয়, তাদের কাছে অত্যধিক মূল্যবান সম্পদ। সে সব দেশে বিরাট বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠী মুসলমান। এসব মুসলিম দেশ আদমশুমারীর গড় হার অনুপাতে ইউরোপের বড় বড় দেশ থেকে অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ। এসব মুসলিম দেশ জনশক্তি ছাড়াও আল্লাহ্ প্রদত্ত অসংখ্য মূল্যবান খনিজ সম্পদের অধিকারী। এখানে আল্লাহপ্রদত্ত এমন মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে যা ছাড়া পশ্চিমা বিশ্বের গাড়ির চাকা মুহূর্তের জন্যও ঘুরতে সক্ষম নয়। এসব সম্পদ হল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনোলজির চালিকাশক্তি। এদিক থেকে বিশ্বের কোন দেশ মুসলিম বিশ্বের মুকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে না।

এছাড়া মুসলিম বিশ্বের সাধারণ মুসলিম জনগণ মানবিক গুণাগুণ, জীবনীশক্তি ও নীতি-নৈতিকতা দ্বারা পরিপূর্ণ। তাদের মাঝে এখনো এমন কর্মশক্তি, ত্যাগের আগ্রহ, অন্যদের প্রাধান্য দেবার জযবা, আনুগত্য করা এবং জীবনোৎসর্গ করার মানসিকতা রয়েছে যা অন্যকোন জাতির মাঝে নেই।

যারা বিশ্ব ভ্রমণ করার গৌরব অর্জন করেছে এবং যারা দুনিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ও জনসাধারণের মানসিকতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাদের মন্তব্য হল, মুসলিম বিশ্বের জনসাধরণের তুলনায় অন্য কোন দেশের জনসাধারণ উত্তম নয়। কারণ, এখনো তাদের মাঝে রয়েছে জীবনের স্পন্দন। তারা এখনো যেকোন কল্যাণকর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে সক্ষম। যদি তাদের সঠিক নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হয় তাহলে তারা এখনো বিশ্বের এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পারে। কারণ তাদের মত মুখলিস, নিষ্ঠাবান, তাদের মত সহজ সরল, স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, তাদের মত আস্থাভাজন ও উষ্ণ মহব্বতের অধিকারী, তাদের মত অনুগতপরায়ণ অন্য কোন জাতির মাঝে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাদের এ মূল্যবান যোগ্যতা দীর্ঘদিন যাবত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেসব দেশের নেতৃবর্গ তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বে-খবর। মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণ থেকে উপকৃত হওয়া, তাদের যোগ্যতা কাজে লাগানো এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার করার মত যোগ্যতা না আছে ঐসব নেতৃবর্গের আর না আছে আন্তরিকতা।

আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও সামগ্রিক সমস্যা কি? তাহলে আমি কোন প্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়াই বলব যে, মুসলিম জনসাধারণের নেতৃত্বের সমস্যা। নেতৃবর্গের ভিন্ন মতাদর্শ আর জনসাধারণের মানসিক অস্থিরতা। সে দেশের সর্বস্তরের মুসলিম জনগণ ইসলামের উপর বাঁচতে ও মরতে চায়। ইসলামী ভাষা ও পরিভাষা ছাড়া অন্যকিছু বুঝতে চায় না। আল্লাহ্ ও রাসূল, আখেরাত ও জান্নাত, জিহাদ ও শাহাদত, আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখেরাতের প্রতিদান ও ছওয়াব ছাড়া অন্য কোন জিনিসের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ নেই। এছাড়া অন্য সবকিছুই অর্থ ও মূল্যহীন। ধর্মীয় শ্লোগান ও দাওয়াত ছাড়া অন্য কিছু তাদের রক্তের মাঝে উষ্ণতা এবং দেহের মাঝে উদ্যমতা সৃষ্টি করতে পারে না। এছাড়া ভিন্ন কিছু তাদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মতৃপ্তি প্রদান করতে সক্ষম নয়। ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু তাদেরকে আত্মত্যাগ ও কুরবানী দিতে উৎসাহ প্রদান করতে অক্ষম। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের আহ্বান ও শ্লোগান আলজিরীয় মুসলমানদেরকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে এমন আত্মোৎসর্গ ও আত্মবলি দিতে প্রস্তুত করেছিল যার নজীর বিরল। আর প্রতিটি দেশ স্বাধীনতার সংগ্রামে এ ইসলামী শ্লোগানকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ সে দেশের মুসলমান ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও মুহাব্বতকারী। ইসলাম অন্যসব মতাদর্শ হতে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর বলে বিশ্বাসী। তারা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মুসলিম সামাজিক রীতিনীতির প্রতি আস্থাশীল। বিধায় তারা তাদের দেশে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রচলন দেখতে চায়। তারা চায় তাদের দেশে আল্লাহ্ ও রাসূলের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হোক। এছাড়া ভিন্ন কিছুর প্রতি তাদের আকর্ষণ নেই।

মুসলিম উম্মাহর বড় দুর্ভাগ্য ঃ

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, যেসব ব্যক্তির হাতে মুসলিম উম্মাহর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, যারা তাদের রক্ষক ও পথিকৃৎ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ইসলামী ভাবধারা, ইসলামী পরিবেশ, ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস, ইসলামী চিন্তা-চেতনা থেকে ভিন্ন এক পরিবেশে হয়েছে। ফলে তাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা ভিন্ন ধাঁচে প্রস্তুত হয়েছে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এমন শহরে হয়েছে যেখানে আজ আপনারা জ্ঞানান্বেষণ করছেন। তাদের পশ্চিমা শিক্ষকগণ তাদের দিল ও দেমাগে ক্ষুদিত করতে সক্ষম হয়েছে যে ইসলামের যুগ শেষ হয়ে গেছে। ইসলাম সীমিত পরিসরে ও অনুন্নত দেশে বিশেষত যে দেশে তার আবির্ভাব সে দেশে খুব নগণ্য

কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আজ এ উন্নত বিশ্বে ও বিশ্বপরিসরে তার কাছে দেবার কিছুই নেই। ইসলাম আজকের এ পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোন প্রকার ফিট হবার নয়। এটা কতই না দুঃখজনক কথা। কারণ মুসলিম উম্মাহ তো এখনো ইসলামের প্রতি আত্মবিশ্বাসী, তাদের মাঝে এখনো মুহাম্মদ বিন কাসেম, তারেক বিন যিয়াদ, মূসা বিন নাসীর এবং মুহাম্মদ আল-ফাতেহ এর মত নেতৃত্ব জন্ম দিতে সক্ষম। কিন্তু যাদের হাতে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব তারা ইসলামের উপর অনাস্থাশীল, তারা ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ, ইসলামের ব্যাপারে তাদের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সদিচ্ছা নেই। অথচ তারা ইউরোপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এজন্য এসেছিল যে, তারা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে মুসলিম উম্মাহর উপকার সাধন করবে, এখানের সাইন্স ও টেকনোলজি, শিল্প ও কারিগরি এবং অন্যান্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যেগুলোর মাধ্যমে ইউরোপ প্রাচ্যের মুসলিম দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা অর্জন করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতে ব্যবহার করবে।

প্রয়োজন নতুন সুয়েজখালের ঃ

তারা ইউরোপের মাটিতে এজন্য এসেছিল যে, এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে এক নতুন সুয়েজ খালের সূচনা করবে। কারণ, সুয়েজ খালের বৈশিষ্ট্য হল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে সমতাভিত্তিক আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই প্রয়োজন ছিল ইউরোপ থেকে জ্ঞান অন্বেষণকারী এ সুয়েজ খালের মাধ্যমে প্রাচ্যের ঈমান ও একীন, সৎকর্মপরায়ণতা পাশ্চাত্যের কাছে পৌছবে এবং পাশ্চাত্যের কাছ থেকে তার কল্যাণকর ক্ষতিহীন উপায় ও উপকরণ প্রাচ্যের নিকট পৌছে দিবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যাদের থেকে আশা করার ছিল এবং যাদের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা ছিল তারা পশ্চিমাদের অনুকরণপ্রিয় হয়ে বসে থাকল। বর্তমানে তাদের সকল কর্মকাণ্ড নির্বুদ্ধিতা, নতুনত্ব ও উদ্ভাবনহীন, সাহসিকতাশূন্য ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মেধাশূন্যতার পরিচয় পেয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে নেতৃত্ব প্রদানের পরিবর্তে পশ্চিমাদের অন্ধানুকরণ ও লেজুড়বৃত্তে পরিণত হয়েছে। তাদের পরিচয় আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت : وہ کند دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو

যারা দিতে পারত যুগের নেতৃত্ব
তারা আজ মেধাশূন্য, অনুকরণপ্রিয়।

ইউরোপে জ্ঞান অন্বেষণকারী যুবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

প্রিয় মুসলিম যুবদল! আপনারা ইউরোপে মোমের মত গলে তরল হয়ে যাবেন এজন্য আসেননি। বরং এখানে আসার উদ্দেশ্য হল, এক নয়া জগতের জন্ম দিবেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ও তাঁর অনুসারীরাই পারে এক নতুন পৃথিবীর জন্ম দিতে। কারণ, তাদের পবিত্র ও আমানতদার হাতেই নির্মিত হয়েছিল পবিত্র কাবা শরীফ। আর তাই বর্তমানে তার অনুসারীবৃন্দ পারে এক নতুন পৃথিবীর জন্ম দিতে। আজকের বিশ্ব তাদেরকে আহ্বান করে বলতে বাধ্য হচ্ছে ঃ

معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز

গৌরবময় বিশ্ব গড়তে কাবার নির্মাণকারীগণ এগিয়ে আস।

আপনারা অনুকরণের উর্ধ্বে ঃ

আপনারা ইউরোপে এ জন্য আসেননি যে, আপনারা এখান থেকে ফিরে প্রাচ্যের মুসলিম অধিবাসীদেরকে তোতা পাখির মত এখানকার মুখস্তবিদ্যার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন, বানরের খেলার মত অনুকরণপ্রিয় হবেন। বরং প্রাচ্যের মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রয়োজন হিম্মতওয়ালা জ্ঞানী মানুষের যারা পশ্চিমা বিশ্বকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে সক্ষম হবে যে, তোমরা এখানে ভুল করেছিলে। তারা পশ্চিমা বিশ্বের জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা দিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাষায় বলবে–

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ.

অর্থ ঃ আমরা তোমাদের মতাদর্শকে অপছন্দ করি। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা স্থায়ীভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে যতদিন না তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (আল মুমতাহেনা, আয়াত ৪)

কিন্তু ইউরোপ থেকে ফিরে আসা যুবদল এক কথাই বলতে জানে। আর তা হল, পশ্চিমা বিশ্ব যা কিছুই করে সবই মঙ্গলময় ও কল্যাণকর। এসব লোক মুসলিম বিশ্বের কি কল্যাণ বয়ে আনতে পারে?

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন এমন দুঃসাহসী জড়তাহীন স্পষ্টভাষী যুবদলের যারা পশ্চিমা বিশ্বের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সক্ষম।

মুসলিম বিশ্বের কাছে পশ্চিমাদের অন্ধানুকরণপ্রিয় যুবকদের কোন মূল্য নেই। কারণ, তারা পশ্চিমাদেরকে তো মুকুট হিসেবে গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে তারা প্রাচ্যের মুসলিম জনসাধারণকে পদদলিত করছে। তুরস্ক, মিসর, ইন্দোনেশিয়া বা অন্যান্য মুসলিম দেশে বর্তমান নেতৃত্ব কোন প্রকার উদ্ভাবনাময় যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আপনাদের স্থান তাদের ঊর্ধ্বে হওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ, তারা পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ ও নেতৃত্বের পদতলে সর্বস্ব কুরবান করে দিয়েছে। আর এর বিনিময়ে যে ভিক্ষার ঝুড়ি গ্রহণ করেছে তা পশ্চিমাদের হাতে উৎসর্গকৃত সম্পদের তুলনায় মূল্যহীন।

শুধুমাত্র বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার হলেই যথেষ্ট নয় ঃ

প্রিয় বৎসগণ! আপনাদের এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। যারা আপনাকে এখানে প্রেরণ করেছে তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় যে, আপনি তাদের কাছে শুধুমাত্র একজন দক্ষ বিজ্ঞানী, একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, একজন বিজ্ঞ আর্টিস্ট এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে একজন পণ্ডিত হয়ে ফিরে আসবেন। যদি শুধু ইঞ্জিনিয়ার বা সায়েন্সটিস্ট বা শুধুমাত্র আইনবিশারদ হয়ে ফিরে আসেন তাহলে আপনি নিজের দেশের সঠিক মঙ্গল করতে সক্ষম হবেন না। বরং আপনার জন্য প্রয়োজন হল ঐ সকল জ্ঞান বিজ্ঞানে আপনার নেতৃত্বদানকারী পদচারণা। যদি আপনি আইনের ছাত্র হন তাহলে আপনার জন্য প্রয়োজন হল ইসলামী আইন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা। অতঃপর আধুনিক আইন শাস্ত্রের মূলনীতিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন। আপনারা দেশে ফিরে গিয়ে পাশ্চাত্যের দুরাবস্থার কথা জনগণকে বলবেন। আপনারা দেশের জনগণকে শুনাবেন যে, বর্তমান পশ্চিমা বিশ্ব একটি পরিপক্ক ফলের মত যা যেকোন মুহূর্তে খসে পড়ে যেতে পারে।

যদি আপনারা প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে ফিরে গিয়ে পশ্চিমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালোর বর্ণনা দেন এবং তাদেরকে ত্রুটিমুক্ত বলেন তাহলে আপনি স্বদেশ ও জাতির সাথে প্রতারণা করবেন এবং এক অবাস্তব ঘটনা তাদের সামনে উপস্থাপনা করবেন। বরং আপনি দেশে গিয়ে স্বদেশবাসীকে পাশ্চাত্যের ভাল গুণগুলো তুলে ধরবেন। তাদের মুক্তির রহস্য কি তা খুলে বলবেন, তাদের জীবনের কোন জিনিসগুলো অনুকরণীয় তা তুলে ধরবেন। এভাবে পশ্চিমা সভ্যতায় কি কি রোগ আছে, যা তাদের সভ্যতার বৃক্ষকে ঘুণে খাওয়ার মত কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে তা আপনি স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরবেন। তারা কেমন নীতিহীনতা ও আখলাকী অপরাধে লিপ্ত সে কথা দেশবাসীর কাছে সুস্পষ্ট ভাষায়

তুলে ধরবেন। তাদের কোন আদর্শ ও রীতিনীতি আমাদের বর্জন করা প্রয়োজন এবং যেগুলো পশ্চিমাদের নেতৃত্ব ও শক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয় তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিবেন।

আপনাদের করার অনেক কিছুই রয়েছে ঃ

যদি এ কথা দিল্লি, করাচি বা কায়রোতে গিয়ে বলতাম বা প্রাচ্যের কোন মুসলিম দেশের নেতৃবর্গের নিকট উপস্থাপন করতাম, যারা চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে পরিপক্কতা অর্জন করছে তাহলে সেখানে আমার কথা বলার সময় পার হয়ে গেছে। কারণ, চিন্তা-চেতনা, দিল ও দেমাগ এখানে প্রস্তুত করা হয় আর দেশে তার কার্যকারিতা শুরু হয়। তাই বলার ক্ষেত্র এটা যেখানে প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং একথা বলার সময় এখনো পার হয়নি। বরং এ কথা বলার এখানেই সময় যে, আপনারা স্বদেশের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবেন। ক্ষমতার মসনদে আপনারাই অধিষ্ট হবেন। তাই স্বজাতির পুনর্গঠন করা আপনাদের দায়িত্ব। সুতরাং যদি আপনাদের স্বজাতির মহান যোগ্যতার ও তার মূল্যায়নের কথা এদেশের মাটিতে বসে আপনাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আপনাদের দিলে এখানে থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও তার কল্যাণকর হবার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় তাহলে আপনি সবকিছুই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দাওয়াত ও আমল ঃ

আপনাদেরকে যেসব দেশের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা অনেক বড় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এত বড় সোসাইটি এবং জনশক্তি অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি। আপনারা যেসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, ধন-সম্পদের খাজানা ও মানবিক গুণাগুণ সম্পর্কে জরিপ করুন এবং তার একটি অত্যাধুনিক বাজেট প্রস্তুত করুন। আপনারা আপনাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ঐ সম্পদ ও প্রাচুর্যতাকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে ব্যবহার করুন। আপনারা নিঃস্বার্থ খেদমতের দৃষ্টান্ত পেশ করুন। যদি আপনারা এমন করতে সক্ষম হন এবং ইসলামী নেতৃত্বের সঠিক স্থান দখল করতে পারেন তাহলে দুনিয়া ও ইতিহাসের পাতায় ঐ স্থান দখল করতে সক্ষম হবেন যা কামাল আতাতুর্ক, জামাল আব্দুন্ নাছের, বিন বিল্লাহ, আহমদ সেজানো বা অন্য কোন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অর্জিত হয়নি।

এ জনপ্রিয়তা ও গণআস্থা উম্মতের পুনর্জাগরণ, এলায়ে কালিমাতুল্লাহ ও নিঃস্বার্থ খেদমতের কারণে অর্জিত হয়। এটা বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অর্জিত হয়ে থাকে। আর এভাবে মুসলিম বিশ্ব ধর্মীয়, আখলাকী ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব হতে মুক্তি পেতে সক্ষম হবে। মূলতঃ এসব দ্বন্দ্ব ঐসব নেতৃবৃন্দ অহেতুক সৃষ্টি করে রেখেছে। অথচ এসব দ্বন্দ্বের সাথে জনগণের মানসিকতা, তাদের আকীদা বিশ্বাস ও রীতিনীতির সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

আপনারা নিজেদেরকে আবিষ্কার করুন ঃ

আপনারা স্বীয় যোগ্যতা ও স্বজাতির বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে পরিচিত হন। নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের উন্নতি ও অগ্রগতি, বিজয়ের ব্যাপক সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করুন, আপনার অজানা নতুন জগত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি বিপ্লব সংঘটিত করুন।

আপনারা আমাকে বা আমার কথা অনুধাবন করুন আর না করুন, আপনারা নিজেদেরকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

বিশ্ব মানবতার কাছে নবীদের পয়গাম

অহংকারের ভয়ংকর পরিণতি ঃ

কথিত আছে যে, একবার এক উচ্চবংশীয় রাজা নদীতে গোসল করতে করতে এক পর্যায়ে ডুবে মরতে লাগল। কোন নীচু বর্ণের লোক এ দুরবস্থা দেখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে রাজাকে কিনারাই উঠাল। রাজার যখন হুঁশ ফিরে আসল তখন সে তার ত্রাণকর্তার নাম জিজ্ঞেস করল। যখন রাজা জানতে পারল যে, তার ত্রাণকর্তা একজন নীচু বর্ণের লোক তখন সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং হুকুম দিল যে, যে বদজাত তার দেহতে হাত লাগিয়ে তাকে নাপাক করেছে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হোক। সুতরাং ঐ মহানুভব ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হল। আর দেশবাসীও শিক্ষা গ্রহণ করল।

ঘটনা ওখানেই শেষ হল না । এরপর আবার রাজার সাথে ঘটনার পুনাবৃত্তি ঘটল। রাজার জীবন আশংকাযুক্ত হয়ে পড়ল। পূর্বের অপরাধী ঘটনা দেখতে ছিল এবং খুব সহজেই রাজাকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু তার অপরাধের সাজা সে পুরোপুরি ভোগ করেছে। এ জন্য দ্বিতীয়বার রাজার দেহকে নাপাক করার হিম্মৎ ভুলেও হল না। ফলে এর পরিণাম হল এই যে, বেদরদ এবং হৃদয়হীন নদী উচ্চবংশীয় রাজাকে ডুবিয়ে তার সলিলসমাধী ঘটাল। সত্যিকার অর্থে মানুষের বোকামীর একটি সত্য দস্তান। যার নায়ক হল একজন খান্দানী রাজা। মূলতঃ এটা কোন এক রাজার নির্বুদ্ধিতার ঘটনা নয় বরং এটা হাজার হাজার লোক ও অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠির ঐতিহাসিক কাহিনী এবং এক্ষেত্রে কোন প্রকার মিথ্যা বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই।

গ্রীক দর্শনের গোমরাহী ঃ

আপনি হয়ত গ্রীকদের নাম শুনে থাকবেন। গ্রীক হল দার্শনিক, হেকিম ডাক্তার ও কবি সাহিত্যিকদের দেশ। আফলাতুন, এরিস্টোটল. বাকরাত ও সক্রেটদের নাম কে না জানে? তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন সে দেশে শুধু হেকিম ও দার্শনিক জন্মগ্রহণ করে থাকে। সবাই যেন কবি-সাহিত্যিক। সে দেশে আল্লাহর দেওয়া সব কিছুই ছিল। ফালসাফা-দর্শন, হেকমত ও চিকিৎসাবিদ্যা, কবিতা ও সাহিত্য, অংক ও জ্যামিতি, শিল্প ও কলা। এছাড়া আরো অনেক বিদ্যা। মানুষ তার মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা যা কিছু আবিষ্কার করতে পারে তার সব কিছুর উৎস হল গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সভ্যতা। এসব ক্ষেত্রে সে ছিল ওস্তাদের

মসনদে। তার সাগরেদ হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করা হত। এসব কিছুই ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এমন কিছু জিনিস গোটা বিশ্বে রয়ে গিয়েছিল যা মানুষের দেমাগ ও প্রজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাহলে ঐ জিনিসগুলো কি ছিল? এটা হল দুনিয়া সৃষ্টির রহস্য। কিভাবে তা তৈরি হল, কেইবা তা সৃষ্টি করল, কেনই বা তা সৃষ্টি করল, কতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়া দীর্ঘস্থায়ী হবে, স্রষ্টা কিভাবে তা পরিচালনা করতে চায়। এক্ষেত্রে তার বিধান কি? এ জীবনের পর অন্য কোন জীবন আছে কিনা, যদি থেকে থাকে তা হলে তার জন্য কি হেদায়েত রয়েছে। ভালই বা কি আর মন্দই বা কি? হালালই বা কি আর হারামই বা কি? এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন থেকে যায়। সাধারণত এসব প্রশ্নের উত্তর যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রীক এক্ষেত্রে কাব্যকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে। অথচ এটা কাব্যের ক্ষেত্র ছিল না। ফলে প্রতি পদে পদে হোঁচট খেতে বাধ্য হয়েছে। তারা আল্লাহর প্রতি এমন সব দোষারোপ করেছে, সাধারণত একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তাদের ঐ সব অযৌক্তিক কথাবার্তা শ্রবণ করার পর দিল ও দেমাগ খোদা সম্পর্কে ভাল ধারণা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে না। তারা আকল ও আখলাক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৌরজগত সম্পর্কে এমন সব কল্পকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছে বাস্তবতার নিরিখে তার আগা-মাথা বলতে কিছুই নেই। অতঃপর এসব কল্প কাহিনীর সাথে বিশ্ব জগতকে জুড়ে দিয়েছে। গ্রীকদের সনাতন দেব-দেবী (Mythology) কে 'ফালসাফা ও দর্শনের রূপদান করে এবং কাল্পনিক দেব-দেবীদেরকে গবেষণা ও ধর্মীয় পোশাক পরিধান করিয়ে জনসম্মুখে উপস্থাপন করেছে।

গ্রীকদের পরিণতি ঃ

ফলে গ্রীকদের আখলাক, চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় জীবন ও অনুভূতি মৃত্যু ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর মুহাব্বত দিল ও দেমাগ থেকে বের হয়ে গেল। দেব-দেবীদের এশক ও মুহাব্বত, প্রেম-ভালবাসার কিচ্ছা-কাহিনী তাদের কাব্য ও সাহিত্য এবং ধর্মীয় পরিবেশকে খাহেশাতময় ও যৌনচারীতে পরিণত করল। ভাল-মন্দের পার্থক্য মিটে গেল। সকল অপরাধ ও পাপাচার, নাজায়েয কর্ম-কাণ্ড এবং সকল প্রকার জুলুম- অত্যচারের পক্ষ্যে গ্রীক দর্শন দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে লাগল। বড় বড় গ্রীক দার্শনিক বেশ্যাবৃত্তির পূর্ণ ওকালতি করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা বড় বড় উপকারিতা ও সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করেছে। ফলে ঐ আবাদীপূর্ণ জনবসতি ও বিদগ্ধ জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রগুলো কঠিন নৈতিক অধঃপতন ও বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। আর এর পরিণতি হল এই যে, শেষ পর্যন্ত গ্রীক তার সকল জ্ঞান-গবেষণাসহ ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

নবুওয়তী মশাল ঃ

ঠিক যে সময়ে গ্রীক নৈতিক অধঃপতনের শিকার সে সময় গ্রীকদের পশ্চাতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত এবং তুলনামূলক গ্রীকদের থেকে শিক্ষা ও মেধাহীন দেশগুলোতে আল্লাহর নবীগণ জন্মগ্রহণ করেন। তারা গ্রীকদের মত কবি ছিলেন না, দার্শনিক, গণিতবিদ বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না। তারা শিল্প-কলাতেও দক্ষ ছিলেন না। তদপরি তারা ছিলেন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একীনওয়ালা এবং হিদায়তের পথিকৃৎ। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় জাত ও সিফাতের চূড়ান্ত জ্ঞান দান করেছিলেন। দিয়েছিলেন জীবনের রহস্য এবং এ দুনিয়ার পরিণতির ব্যাপারে একীনী ও আমলী জ্ঞান।

গ্রীকদের কাছে ছিল শব্দ আর নবীদের কাছে ছিল বাস্তব জ্ঞান ঃ

গ্রীকদের কাছে ছিল মনোমুগ্ধকর চিত্তরঞ্জক শব্দের সমাহার। পক্ষান্তরে নবীদের কাছে ছিল, প্রতিটি বস্তুর বাস্তব রূপ এবং জ্ঞানের মৌলিক উপাদান। আর গ্রীকদের কাছে ছিল জ্ঞানের অসামঞ্জস্যময় কিছু নীতিমালা। ঐ অসামঞ্জস্যময় জ্ঞানকে তারা শত শত বছর ধরে সঠিক করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা সঠিক হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশি অসামঞ্জস্যময় হয়ে গেছে। আর এ বিভ্রান্তির জ্ঞানই তাদের হাতে রয়ে গেছে।

নবী ও ফিলোসফীদের পার্থক্য ঃ

গ্রীক দার্শনিকদের বাস্তব অবস্থা হল যে, তারা জ্ঞানসমুদ্রের পাড়ে থাকা নূড়ি-পাথর ও শামুক নিয়ে খেলতেছিল। অন্যদিকে নবীগণ জ্ঞানসমুদ্র পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিয়ে আসল মণি-মুক্তা নির্গত করে সমগ্র মানবতাকে অলংকৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রীক দার্শনিকগণ সব কিছুই অবগত হতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু তারা নিজেকে অবগত হতে সক্ষম হননি। গ্রীক দার্শনিকগণ সারা বিশ্বের ইতিহাস সংকলন করতে সক্ষম হয়েছিল, সমগ্র বিশ্বজগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার গৌরব অর্জন করেছিল কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এ বিশাল পৃথিবীর স্রষ্টা ও একক অধিকর্তা পরিচালনাকারী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়নি। গ্রীকদের ফালসাফা ও দর্শন এবং তাদের নীতিমালা আসল রূহ ও কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে তা মানুষের মাঝে পবিত্র জীবন যাপন করার শক্তি ও খোদাভীতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। খাহেশাত, পাগলামী ও নৈতিক অধঃপতন তাদের রক্ত-মাংসে, দিল ও দেমাগে এবং দেহের রুন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল।

অন্যদিকে আল্লাহর নবীগণ ছিলেন আখলাখ ও উত্তম আদর্শের পরশ পাথর। যারাই তাদের স্পর্শ করত সেও স্বর্ণে পরিণত হত। গুনাহ ও খাহেশাত পূরণের মানসিকতা দূর হয়ে যেত এবং আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং গুনাহ পরিত্যাগ করার আগ্রহ তার মাঝে সৃষ্টি হত। অন্যদিকে গ্রীক দার্শনিকগণ শিক্ষিত করে একজনকেও সঠিক পথে আনতে এবং মন-চাহি জিন্দেগী পরিত্যাগ করার শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু নবী মূর্খ, অশিক্ষিত হাজারো মানুষকে নিকৃষ্ট পশুত্ব থেকে উঠিয়ে মানুষের সুউচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছে এবং নফস ও শয়তানের কঠিন আক্রমণের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে বিজয় লাভে ধন্য হয়েছে।

জ্ঞানের অহংকার ঃ

নবীগণ গ্রীক জাতির সামনে কোন প্রকার প্রতিদান ছাড়াই মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে চেয়েছিল। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকগণ তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, এসব অশিক্ষিত মূর্খ লোকের পরামর্শ ও হেদায়াত গ্রহণ করা আমাদের জ্ঞানের অপমান করার নামান্তর। কারণ আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামনে তারা মকতবের ছাত্র সমতুল্যও নয়। এমন কি জ্ঞান রয়েছে যা আমাদের কাছে নেই এবং এ জন্য আমাদেরকে অন্যের কাছে দ্বারস্থ হতে হবে? ফলে এর পরিণতি হল এই যে, ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান যা নিয়ে তারা অহংকারে লিপ্ত ছিল তা তাদের জন্য ফাঁসীতে পরিণত হল। খোদার পরিচয়হীন ও নবীদের হেদায়েতবিহিন তাদের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি তাদের জন্য বিষাক্ত হয়ে গেল এবং ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি তাদের দেহকে ঝাঁজরা করে দিল এবং জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলল।

পবিত্র কুরআনে তাদের চিত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ـ

যখন তাদের কাছে নবীগণ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হল তখন তারা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর অত্যন্ত অহংকার করল এবং তারা যেমন আজাবের ব্যাপারে বিদ্রূপের হাসি হাসত, তদ্রূপ আজাব তাদের উপর এসে পড়ল। (আল মুমিন ঃ ৮৩)

রোমীয়দের হালাকতের দস্তান ঃ

গ্রীক দার্শনিকদের রাজনৈতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিষ্য রোমানীয়দের পরিণতিও ঠিক এমনই হয়েছিল। তারা সুশৃঙ্খল জীবন, সংবিধান তৈরি, যুদ্ধবিদ্যা, দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবকাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদেরকে হার মানাতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার মত বিশাল তিনটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল তাদের রাজত্ব। এছাড়া অনেক দূর দূরান্তের অসংখ্য দেশকে তারা তাদের সম্রাজ্যবাদের আওতায় শক্তভাবে জুড়ে রেখেছিল। এগুলোকে এক জাতিতে পরিণত করা, বিজয়ের আধিক্যতা, রাষ্ট্র ও আইন-সংবিধান প্রণয়নের যোগ্যতা, শিল্প-কলার পৃষ্ঠপোষকতা করা, চিত্র অংকন ও পাথরে কারুকার্যতা করণ এবং স্থাপত্য শিল্পে তারা দক্ষতা ও পূর্ণতা অর্জন করেছিল। এতদসত্ত্বেও তারা মানব জীবনের রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি এবং জীবনের বাস্তবতা থেকে তারাও উপকৃত হতে পারেনি। ফলে তারা নক্ষত্র পূজা ও মূর্তি পূজাতে আপদমস্তক ডুবে গিয়েছিল। উন্নত নীতি-নৈতিকতা থেকে তারা ছিল রিক্তহস্ত এবং নির্ভুল ও পরিপূর্ণ নেতৃত্ব থেকে তারা হল বঞ্চিত। এতে তারা অসংখ্য আখলাকী ও রূহানী রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। অপচয়, ও অহেতুক খরচ, আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতাময় জীবন, আমোদ-প্রমোদ ও সীমাহীন লুট-তরাজীর মাধ্যমে অর্থাপর্জনের কারণে তাদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে পড়ল। তাদের কুরুচি ও ভ্রান্ত মানসিকতা এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে তারা বন্দিদের পরিধেয় বস্ত্রে তেল ছিটিয়ে দিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিত এবং সে নির্মম আলোক রশ্মিতে বড় বড় ভোজের ব্যবস্থা করাকে অত্যন্ত সুখময় ও আনন্দদায়ক মনে করা হত।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঃ

এই নৈতিক অধঃপতনের সময়ে রোমান সম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বেশ কয়েকজন নবীর আবির্ভাব হয়। তাদের নবুওয়ত ও দাওয়াতের খবর রোম সম্রাজ্যের অলি-গলি ও শহর-বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু রোম সম্রাট পরাধীন জাতির ধর্মপ্রচারক ও নবীদের কথা গ্রহণ করাকে নিজেদের জন্য অপমান মনে করল। কারণ যে রোমানীয়রা নিজেদেরকে জন্মগতভাবে সম্রাট মনে করত। তাদের পক্ষে পরাধীন জাতিকে হৃদয়ে মর্যাদার আসন দেওয়া কি সম্ভব ছিল? সব সময় অহংকারী ও আত্মাভিমানীদের এটাই ছিল দলিল ঃ

لَوْكَانَ خَيْرًامَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ ـ

যদি নবীদের আনিত ধর্মে কোন কল্যাণ থাকত তাহলে আমাদের অগ্রে অন্য কেউ এ সম্পদ লাভে ধন্য হতো না। (আল আহক্বাফ ঃ ১১)

আর এ কারণেই রোমানীয়রা নবীদের অবমূল্যায়ন করে। তারাও অন্যান্য জাতির মত, জাতীয়তাবাদ ও জাতিগত অহংকারে শিকার হয়ে নৈতিক অধঃপতন, বিশৃঙ্খলা ও ইতরামীর সয়লাবে ডুবে মরল।

এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হল–

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ۔

আর এ ধ্বংসের কারণ হল যে, যখনই নবী ও রাসুলগণ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণসহ তাদের কাছে আসত তারা বলত, আমাদের মত লোকেরাই কি আমাদের সুপথ দেখাবে? (এ বলে) তারা নবী ও রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করল তাদেরকে অস্বীকার করল, এবং তারা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আল্লাহ (তায়ালাও) তাদের পরওয়া করলেন না। কারণ আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। (সূরা আত-তাগাবুন ঃ ৬)

ইরান, চীন ও ভারতে ধর্মীয় অস্থিরতা ঃ

খৃষ্ট্রীয় ষষ্ঠীশতাব্দীতে রোম, ইরান, চীন ও ভারত পৃথিবীর অত্যন্ত সভ্যতাময় দেশ হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু মানবতার প্রতিটি ডালে ঘুণ ধরেছিল। নবুওয়তের মশাল থেকে যে চেরাগ জ্বলতেছিল তাও তখন তেলহীন হয়ে পড়েছিল এবং নিঃপ্রভ হতে চলেছিল।

যুক্তি ও দর্শনের রাজত্ব ঃ

তৎকালীন সময়ে আল্লাহর একীন ও সঠিক আল্লাহ প্রদত্ত এলেমের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল। তখন এলেম ও ধর্মীয় বিষয়ে যুক্তি ও দর্শনের পূর্ণ রাজত্ব চলছিল। নৈতিকতা, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে চলছিল খাহেশাতের গোলামী। গোটা বিশ্ব এ গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ছিল খাহেশাত পূর্ণ এবং দরবেশীপনাও ছিল খাহেশাতপূর্ণ। গীর্জা, মন্দির, মঠ ও অন্য সকল ধর্ম চর্চাকেন্দ্র মানুষের সুপথ দেখাবার চিন্তা পরিত্যাগ করেছিল।

আধ্যাত্মিকতা শূন্য খৃষ্টধর্ম ঃ

খৃষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা অন্য সকল ধর্মগুলোকে অবলোকন করলে মনে হত যে, এসব তেলিদের কাছে আর তেল নেই। তারা এখন সঠিক রূহানীয়ত ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ খোদাভীতি, দায়িত্ববোধ, পবিত্র ও সৎ জীবন যাপন করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে অক্ষম। তাদের এমন কোন সুস্পষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা এবং জীবন যাপনের আলোকময় পথ ও সুবিস্তারিত বিধি বিধান ছিল না যার উপর ভিত্তি করে আদর্শ ব্যক্তি জীবন বা সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে।

জুলুম ও অপচয় ঃ

তৎকালীন পারস্য ও রোমান সম্রাজ্য গরিব জনসাধারণের উপর নিত্য নতুন ট্যাক্স ও জরিমানা ধার্য করে রেখেছিল, ফলে কৃষক ও দিনমজুর শ্রেণী পেরেশানহাল ও ব্যতিব্যস্ত জীবন যাপন করত। জরিমানা ও ট্যাক্স আদায় করতে যেয়ে উন্নতর' জীবন যাপন করা এবং জীবনকে কোন উঁচু লক্ষ্য উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করার মত হুঁশ তাদের থাকত না। বরং কলুর বলদের মত তাদের নিঃশ্বাস নেবার মত ফুরসত হত না। প্রাচুর্যের নেশা, বাদশাহ ও শাসক শ্রেণীর অন্ধানুকরণ এবং সমাজের চাহিদাপূরণ করতে যেয়ে মধ্যবিত্তদের অবস্থা ছিল আত্মভোলাদের মত। জীবন যাত্রার মান এত উন্নত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন কোন ইরানী নেতা লক্ষ টাকার, আবার কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকার মুকুট পরিধান করত। যদি কেউ এমন না করত তাকে অপমান করা হত। খানা-পিনা, লেবাস-পোশাক, দালান-কোঠা ও পারিবারিক জীবনে ভোগ বিলাসিতা ও কৃত্রিমতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

ভারত বর্ষের অবস্থা ঃ

ভারত বর্ষে জাত-পাত ও উঁচু-নিচুর পার্থক্যের এবং মানুষের জন্মগত বিভক্তির ক্ষেত্রে সীমাহীন বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। মানবীয় চাহিদাপূরণ ও যৌন মিলনের কাহিনীতে ভরা ছিল সাহিত্য ও ধর্মীয় গ্রন্থ ভাণ্ডার এবং তদানিন্তন উপাসনালয় পর্যন্ত এরূপ ধারণ করেছিল। দৌলত পূজা ও শক্তির বন্দনা করার বিষয়টি তাদের অস্তি-মজ্জাতে প্রবেশ করেছিল। ধর্ম ছিল কতিপয় রীতিনীতি ও আনন্দ-বিনোদনের বস্তু এবং কতিপয় দার্শনিক পরিভাষার নাম। বস্তুতঃ দুনিয়ার এ সভ্য জাতি সভ্যতার সৃষ্ট কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে তারা আল্লাহর দীনকে মানসিকভাবে গ্রহণ করার এবং এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এবং একে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্যতা থেকে মাহরূম হয়ে গিয়েছিল।

দ্বীনের রহমতের পয়গামে হিদায়াত ঃ

আল্লাহ তায়ালার হিকমত দুনিয়াকে পুনঃজীবন দান করার জন্য এমন এক জাতিকে নির্বাচন করল যারা মূর্তিপূজা ও নৈতিক অধঃপতনের ক্ষেত্রে অন্য কোন জাতি থেকে পিছিয়ে ছিল না। তথাপি তারা সভ্যতা সংস্কৃতি, মাল-দৌলত, রাষ্ট্র, সরকারের আনিত বিগাড় এবং রাজনীতি ও প্রবৃত্তির গোলামদের সৃষ্টি করা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল। এতসদসত্ত্বেও আল্লাহপাক এ জাতিকে নির্বাচন করলেন কারণ তারা বংশীয় মর্যাদা, স্বভাবগত যোগ্যতা এবং এ মহান কাজের জিম্মাদারী আদায়ের যোগ্যতা, বুলন্দহিম্মত ও সৎসাহসের ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী থেকে অনন্য ছিল।

اللّٰه اعلم حيث يجعل رسالته ـ

আল্লাহই অধিক জ্ঞাত, তিনি তার পয়গমের জন্য যাকে নির্বাচন করবেন।
(আল আনআম ঃ ১২৫)

তাদের দৃঢ় সংকল্প ও মানসিক স্থিরতা, তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ, তাদের বেনজীর সফলতা, তাদের সুউচ্চ আখলাক, তাদের পবিত্রময় জীবন যাপন একথা প্রমাণ করেছে যে, নবুওতী দায়িত্বের জন্য বিশ্বমানবতায় তাদের থেকে আর কোন জাতি অধিক যোগ্য ছিল না। মানবতা পরিণত বয়সে উপণিত হয়েছিল দুনিয়ার ভবিষ্যত বলে দিচ্ছিল যে, দুনিয়া এখন দেশ ও জাতি গোষ্ঠির পরিসীমানার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদুর রাসূল (সাঃ)-কে এমন এক সুস্পষ্ট, বিস্তারিত, নির্ধারিত ও সুশৃঙ্খল মোহর বিশিষ্ট ধর্ম দান করলেন যা একই সাথে দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার সকল জাতি গোষ্ঠিকে এবং জাতি গোষ্ঠির সকল সম্প্রদায়কে এবং সকল সদস্যের সর্বাবস্থার সাথে সামঞ্জস্যময়। এ ধর্ম একই সাথে রাজা ও প্রজা, সরকার ও জনগণ, ধনী ও গরিব, নারী-পুরুষ, সুস্থ-অসুস্থ, যুবক- বৃদ্ধ, অধিক বা কম যোগ্যতার অধিকারী, শহরীয় ও গ্রাম্য, জ্ঞানী ও মূর্খ সকলকেই সুপথ দেখাতে সক্ষম। প্রত্যেকেরই নিজের গণ্ডিতে নিজের যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে এবং নিজের যোগ্যতা অনুপাতে মানুষের গণ্ডির ভিতর থেকে স্বীয় আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে দেশ-জাতির কোন পার্থক্য বা বিভাজন নেই। যুগের প্রতিনিয়ত প্রতিটি ঘটনা ও মানবীয় সকল জরুরতের ক্ষেত্রে কোন কিয়াস ও যুক্তি বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। আর না আছে বার বার আইন প্রণয়ন ও সংযোজন বা সংশোধন করার কোন প্রয়োজন। এ ধর্ম শুধু আকীদাগত বিষয় নয় বরং আখলাক ও নীতিগত নিয়ম-কানুন, সামাজিক ও রাজনীতি সংক্রান্ত সকল বিধিবিধান প্রণয়ন

করে রেখেছে। এ ধর্ম শুধু কাগজে বা কিতাবের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এর রয়েছে বাস্তবভিত্তিক সকল নমুনা। যা প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সীরত নামে পরিচিত। ফলে তা থেকে মানব জীবনের সকল অধ্যায়ের সর্বাবস্থায় পূর্ণ হেদায়ত, দিকনির্দেশনা ও মনোবল অর্জিত হয়।

সাম্যের শিক্ষা ঃ

এ ধর্ম ছিল গোটা মানব জাতির এজমালী সম্পত্তি, এখানে সকল জাতি গোষ্ঠী, সকল রাষ্ট্র ও সরকার ও জনগণের সমান অধিকার রয়েছে। সকলের জন্য উন্নতি ও অগ্রগতি ও উন্নত জীবনের সমান সুযোগ ও অধিকার রয়েছে। এ ধর্মে কোন জাতি গোষ্ঠির ইজারাদারী নেই। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হল–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا جَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ـ

হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যেন তোমাদের পরিচয় দিতে সহজ হয়। আর মূলতঃ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে মর্যাদাময় ব্যক্তি হল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে অধিক ভয় পায়।

এক্ষেত্রে প্রিয় নবী (সঃ)-এর বাণী হল ঃ

كُلُّكُمْ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ وَاٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ ـ لَا فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلٰى عَجَمِىٍّ وَلَا لِعَجَمِىٍّ عَلٰى عَرَبِىٍّ اِلَّا بِالتَّقْوٰى ـ

হে মানবজাতি! তোমরা সকলেই আদম সন্তান। আর আদম হল মাটির তৈরি। তাই কোন আরবের জন্য অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর না আছে কোন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব। তবে মর্যাদার অধিকারী হল তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তি।

হাবশার বেলাল (রাঃ) ও রোমের হযরত সোহাইব (রাঃ)

ইসলামের প্রথম যুগেই আমরা ইরানের হযরত সালমান, হাবশার হযরত বেলাল ও রোমের হযরত সোহাইব (রাঃ) কে কুরাইশ ও আনছারীদের কাতারে দেখতে পাই। আমরা হযরত উমর (রাঃ)-এর মত মহান খলিফা কর্তৃক হযরত বেলাল (রাঃ)কে সায়্যেদুনা বেলাল (আমাদের নেতা বেলাল) সম্বোধন করতে

শুনতে পাই। পরবর্তীতে ইসলামের বড় বড় প্রাণকেন্দ্রগুলোকে নওমুসলিম এবং অনারবের ব্যক্তিবর্গ দ্বীন ও এলেমের মসনদগুলোকে অলংকরিত করে রেখেছিল। তারা বংশাক্রম মুসলিম জাতি গোষ্ঠীকে এবং আরব নেতাদেরকে হেদায়তের বাণী শুনাচ্ছেন। সকলের মাথা তাদের ফাতওয়া ও মাসায়েলের সামনে নত হয়ে রয়েছে। উমহিয়া খলীফা আব্দুল মালেক একজন পর্যটকের কাছে বিভিন্ন শহরের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও ধর্মীয় এলমী ব্যক্তিদের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি অবাক হলেন এ কথা জেনে যে, আট দশটি প্রধান শহরের মধ্যে একটি মাত্র শহরে একজন মাত্র আরব আলেম ফতওয়ার কাজ করেন। আর বাকী শহরগুলোতে এমন অনারব আলেমের এলমী নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে হয়ত সে নিজে বন্দি হয়ে ইসলাম কবুল করেছে নতুবা তার নিকটতম কোন পূর্ব পুরুষ বন্দি হয়ে এসে মুসলমান হয়েছিল। হজ্জের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যেখানে সকল মুসলিম বিশ্বের লোক জমায়েত হয় আরবদের এরূপ বিশেষ স্থান মক্কা নগরীতে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, শুধুমাত্র আতা ইবনে আবী রিয়াহ হাবশী ফতওয়া দিবেন। মূলত ঃ তিনি একজন আজাদকৃত গোলাম ছিলেন। পরবর্তিতে এর নজীর ইতিহাসের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

এক সুবর্ণ সুযোগ ঃ

ইসলাম প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর সকল সদস্যকে দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির পূর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে। তাকে মুসলমানদের কাতারে বড় থেকে বড় বিশেষত্ব অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে। যা একজন হাশেমী বা একজন কুরায়েশী আরব অর্জন করতে পারত।

ইসলামে অনারব মুসলমানদের অবদান ঃ

প্রসিদ্ধ চারজন মুজতাহিদ ইমাম গবেষণা ও ফতওয়ার উপর মুসলিম বিশ্ব হিঃ প্রথম শতাব্দী থেকে এখনো পর্যন্ত আমল করে আসছে। তাদের অন্যতম হলেন ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)। মুসলিম বিশ্বের বিরাট একটা অংশ তার অনুসারী। তিনি ছিলেন ইরানী বংশীয়।

হাদীস শাস্ত্রে যে মহান মণনীষীর গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মনে করা হয় তিনি হলেন ইমাম বুখারী (রঃ)। তাঁর বংশ পরিচিতির তৃতীয় নাম আমরা অনারব ও অমুসলিম দেখতে পাই। পরবর্তী যুগে মুসলমানগণ একজন ইরানী আলেম শায়েখ আব্দুল মালেক আল জুয়েনীকে ইমামুল হারামাইন এবং অন্য একজন ইরানী আলেম ইমাম গাযালীকে হজ্জাতুল ইসলাম নামে নামকরণ করে। এভাবে অসংখ্য অনারব আলেমকে শায়খুল ইসলাম উপাধী দান করে। এসব উপাধী ও

নামকরণগুলো এলমী ও দ্বীনি বিষয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদার ছিল। রাজনীতির দিক থেকে নিশাপুরের সালযুকী খান্দান, সিরিয়ার জংগী পরিবার, মিশরের কুর্দি পরিবার, মধ্য এশিয়ার উসমানী সালতানাত, ভারতবর্ষের দাসদের রাজত্ব ও মিশরের গোলামদের নেতৃত্ব এ বাস্তবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এভাবে আমরা অনারব ও নওমুসলিম খান্দানদের মাঝে এমন অসংখ্য নেক সীরত ও ফেরেশতা সুলভ ব্যক্তি দেখতে পাই। তাদের মর্যাদা মুসলিম বিশ্বে খুলাফায়ে রাশেদা থেকে কোন অংশে কম নয়। যেমন সুলতান নুরুদ্দীন জংগী, সুলতান সালাহ উদ্দীন আয়ুবী, মালিক শাহ সালজুকী, শামসুদ্দীন আলতামাশ, নাছের উদ্দীন মাহমুদ, গিয়াস উদ্দীন বলবন, মাহমুদ শাহ গুজরাতী, মুজাফফর হালীম গুজরাতি হায়দারাবাদের মাহমুদ গাওয়া। এসব ছিলেন নওমুসলিম অনারব বাদশাহ। তাদের প্রশংসায় মুসলিম ঐতিহাসিকগণ পঞ্চমুখ।

ইসলামের বিজয় ঃ

এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইরানী ও রোমানরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিজেদের দুশমন মনে করত। পরবর্তীতে তারা ইসলামের জন্য নিজেদের মনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। অতঃপর তারা আল্লাহর বিশ্ব বিস্তৃত রহমতের বারিধারা থেকে উপকৃত হয়। তারা ইসলাম গ্রহণ করে বড় বড় রূহানী, আখলাকী রাজনৈতিক অগ্রগতি লাভ করে। তারা গোলামীর শৃঙ্খলমুক্ত ও ধর্মের বেড়িমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভে ধন্য হয়। অথচ তাদের ধর্মীয় নেতৃবর্গ,অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী এবং শতাব্দী কাল থেকে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার তাদেরকে বেড়িবদ্ধ করে রেখেছিল। এভাবে তাদেরকে জীবিত কবর দেওয়ার প্রথা সৃষ্টি করে রেখেছিল। পবিত্র কুরআন মাজিদে প্রিয় নবী (সঃ)-এর যেসব গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেসব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তা এ সকল মজলুম জনগোষ্ঠীর ব্যাপরে পূর্ণ সঠিক বলে বিবেচিত হয়। পবিত্র কুরআনের বাণী হল ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ـ

তিনি তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করেন, মন্দ কাজ থেকে বারণ করেন, পাক পবিত্র বস্তু তাদের জন্য হালাল করেন এবং হারাম বস্তুকে হারাম করেন এবং তাদের মাথার উপর অর্পিত বোঝা ও তাদের গলায় আটকে থাকা বেড়ি থেকে তাদেরকে মুক্ত করেন। (আল আরাফ ঃ ১৫৭)

ইসলাম গ্রহণ করে তারা প্রথম বার জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্যদিকে তারা ধর্মীয় এমন উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়, নবুওয়াত ব্যতীত যা সকলেই লাভ করতে সক্ষম। আবার তারা বড় বড় রাষ্ট্রের ভিত্তি রেখে বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-ভাণ্ডারে অমূল্য সংযোজন করেন।

ইউরোপের দুর্ভাগ্য ঃ

স্পেনের রাস্তা দিয়ে ইউরোপে ইসলাম প্রবেশ করে এবং প্রায় আট শতাব্দীর মত সেথায় মেহমান হিসেবে অবস্থান করে। স্পেনীয় আরবদের মাঝে অনেক দুর্বলতা ছিল এবং তারা নিঃসন্দেহে ইসলামের খাঁটি দাঈ ছিলেন না, যেমন সাহাবা কেরাম ছিলেন। তদুপরি তাদের মাধ্যমে ইউরোপের জন্য ইসলামকে বোঝার, পবিত্র কুরআনকে দেখার, ইসলামী বিধি বিধান নিয়ে চিন্তাভাবনা করার এক সুদীর্ঘ সময় তারা পেয়ে ছিল। কিন্তু ইউরোপ ক্রুসেড যুদ্ধে এবং আঞ্চলিক অহংকারের কারণে– যা এখনো ইউরোপিয়ানদের বিশেষত্ব এবং তারা এ বিশেষত্ব অহংকারী গ্রীক ও রোমানদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। ইসলামকে বুঝার সুদীর্ঘ সময়ের এক সুবর্ণ সময় পেয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে স্পেনীয় মুসলমানদের চিকিৎসা বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র থেকে প্রয়োজনের তাগিদে তারা উপকৃত হয়েছে বটে কিন্তু তারা স্পেনীয় মুসলমানদের মৌলিক বিশেষত্বের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বরং তারা স্পেনীয় মুসলমানদেরকে হিংসা ও শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখত। অতঃপর পনের শতাব্দীতে তারা ধর্মীয় পাগলামীতে পাগল হয়ে নেশাগ্রস্ত উন্মাদনায় স্পেনীয় মুসলমানদেরকে সে দেশ থেকে আফ্রিকার দেশগুলোতে বিতাড়িত করে। এক সময় এ মুসলমান জনগোষ্ঠী স্পেনে এসেছিল রহমতের ফেরেস্তা হিসেবে, কিন্তু তাদেরকে সেখান থেকে অত্যন্ত বর্বরতা ও হিংস্রতার সাথে বের করে দেয় এবং তাদের ধর্মীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অত্যন্ত নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয়, যা ছিল ইউরোপের এক মূল্যবান সম্পদ।

ইউরোপের নবজাগরণ ছিল এক ভুলনীতির ভিত্তিতে ঃ

স্পেনীয় মুসলমানগণ বিতাড়িত ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংসের কারণে ইউরোপের নব জাগরণ (Renaissance) বেশ কয়েক বছরের জন্য পিছিয়ে গেল। আবার যখন শুরু হল তখন এমন দিকভ্রান্তের ন্যায় শুরু হল যে এ জাগরণ প্রথমতঃ ইউরোপকে অতঃপর গোটা বিশ্বকে ধর্মহীনতা ও নীতিহীনতা-বস্তুবাদী ও পশুর জীবন পদ্ধতির দিকে নিয়ে গেল। কেননা গোটা বিশ্বের নেতৃত্বে

বর্তমানে ইউরোপের হাতে। আর যেহেতু ইউরোপের কাছে ধর্মের সঠিক আলো ছিল না বা কিছু ছিল তা হল কল্পনা-কাহিনী, সংকীর্ণতা, আর খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাদের লেখা কিছু গির্জাভিত্তিক গবেষণা। ফলে তারা তা প্রতি কদমে গবেষণা করে নিক্ষেপ করে দিতে বাধ্য হত। আল্লাহর জাত ও সিফাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, ওহির সত্যতা ও মহত্ত্ব, রিসালত ও নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা এবং তার বরকত, জীবন সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের সঠিক মর্যাদা ও মূল্যায়ন এগুলো ছিল মূলতঃ একটি সুস্থ সঠিক সভ্যতার বিশেষত্ব ও মূলনীতি। কিন্তু ইউরোপ এসব ব্যাপারে ছিল একেবারে অপরিচিত। ফলে বিকৃত খৃষ্টান ধর্ম তাদেরকে এ ক্ষত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করতে অক্ষম ছিল। কারণ তদানিন্তন খৃষ্ট ধর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গির্জার প্রভাব ও প্রতিপত্তির সংরক্ষণ করার প্রতি আকর্ষণ এবং পবিত্র গ্রন্থের মাঝে সংযোজিত ইতিহাস, ভূগোলে, ও জীবন বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখিত মতামতগুলোকে চূড়ান্ত সত্য বলে মানার দাবিতে ছিল অটল। ইউরোপীয়দের একবার একটি সঠিক ধর্ম উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছিল। তখন যদি তারা তা উপলব্ধি করে নিত তাহলে আজকে ধর্ম, যুক্তি, দ্বীন ও জীববিজ্ঞান নিয়ে এ কঠিন অস্থিরতার সৃষ্টি হতো না এবং ধর্মের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিদ্রোহ ঘোষণা করার প্রয়োজন হত না। কিন্তু তারা তাদের সে সুযোগকে নাদানীর কারণে হাতছাড়া করে ফেলেছে। ফলে এখন তাদের সামনে রয়েছে শুধুমাত্র খৃষ্টানধর্ম, তা আবার অত্যন্ত বিকৃতরূপে। তার মাঝে অনন্ত কালের জন্য কোন পয়গাম ছিল না। আর না ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নতি-অগ্রগতির কোন যোগ্যতা। যা ছিল তা হল তাওরাত বিশ্লেষকদের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এগুলো সব সময় গবেষণার দ্বারা গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন দেখা দিত। ফলে খৃষ্টান ধর্মের ইজারাদারেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার কাছে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে যেত বরং যে সব জ্ঞানী গুণী নিজেদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কারণে গির্জার চূড়ান্ত মতামতকে গ্রহণ করতে পারত না, গির্জা তাদেরকে কঠিন ও শিক্ষণীয় শাস্তি দিত। ফলে এর পরিণতি হল এই যে, ইউরোপ ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হল ধর্ম থেকে পূর্ণ স্বাধীন হয়ে। বরং তারা তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করল ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে।

ধর্ম বিমুখতার পরিণতি ঃ

ইউরোপের এ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির পরিণতি হল এই যে, ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা লক্ষ্যহীন ও গন্তব্যহীন হয়ে গেল। তারা সৌরজগতের ভুল ভুলায়্যার মাঝে হাবুডুবু খেতে লাগল কিন্তু সৌরজগতের মহান স্রষ্টার সন্ধান

পেল না। ফলে তারা গবেষণা ও আবিষ্কারের ভাণ্ডার জমা করল বটে কিন্তু তারা তার মাঝে সমন্বয় সাধন করে, এক কেন্দ্রবিন্দুতে গাঁথা এবং তা দ্বারা জীবনের স্পন্দন ও প্রাণ সঞ্চালন করতে ব্যর্থ হল। তারা এগুলোকে মানুষের জন্য সঠিক ও জনকল্যাণ কর কাজে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হল।

ধর্মবিদ্বেষের দ্বিতীয় পরিণতি হল এই যে, ইউরোপ ধর্মীয় শিক্ষা-দিক্ষা ও তালীম-তরবিয়ত হতে বঞ্চিত হল। ফলে তারা আত্মা ও আখলাকী অনুভূতি এবং নফসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে মাহরূম হয়ে পড়ল। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা অর্জন করতে লাগল কিন্তু আখলাক ও নীতিগত বিষয়ে মানুষের স্তর থেকে নেমে গেল। পরিশেষে তাদের অবস্থা হল এই যে, তাদের দেমাগ তো দার্শনিক ও জ্ঞানগুণীদের মত, তাদের শক্তি তো দৈত্য-দানব ও জ্বীন জাতির মত। কিন্তু তাদের স্বভাব হল শিশুদের মত, আর তাদের মানসিকতা হল শয়তানের মত। উন্নতি ও অগ্রগতির সকল উপায় উপকরণ তাদের করতলগত হল, আর এসব উপায় উপকরণ দ্বারা তারা পানি ও বাষ্প, বিদ্যুৎ ও তাপশক্তিকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হল। কিন্তু সঠিক ধর্মীয় অনুভূতির মাধ্যমে যে কল্যাণ বোধ এবং প্রতিটি বস্তুকে সঠিক কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, তা থেকে তারা মারূম হয়ে রইল। ফলে এর পরিণতি হল এই যে, এসব উপায়-উপকরণ ও আবিষ্কৃত বস্তু মানুষের জন্য অমঙ্গলকর ও তুচ্ছ কাজে বরবাদ হতে লাগল। অথবা মানুষের ধ্বংস বা সভ্যতা সংস্কৃতির বরবাদীর কাজে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বার্থপরতার শয়তান সমগ্র ইউরোপের উপর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। আজ গোটা বিশ্বে এক জাতির হাতে অন্য জাতি, এক শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণী এক মানুষের হাতে অন্য মানুষ বরং নিজের হাতে নিজে হত্যা হচ্ছে। কিন্তু এতেও তারা আত্মতৃপ্ত নয়। বরং তারা ব্যাপক বিস্তৃতভাবে দুনিয়া ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত। কারণ বর্তমানে মানুষ পারমাণবিক শক্তি এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মরণাস্ত্রের উপস্থিতিতে পাহাড়ের চূড়া বা গুহাতেও নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

ইউরোপের জ্ঞান ভাণ্ডার ইউরোপের জন্য ধ্বংসের কারণ

ধর্মের তালীম-তরবীয়ত ও হেদায়ত ছাড়া ইউরোপের এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার অনর্থক হয়ে পড়েছে। বরং তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে পড়েছে। তারা অনেক অপ্রয়োজনীয় ও বিস্তারিত জ্ঞান রাখে। কিন্তু তারা মানব জীবনের মূলনীতি থেকে সম্পূর্ণ জাহেল ও বেখবর। তার উপর আমল করার ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন। তারা সৃষ্টি জগতের অনেক গতিধারা পাল্টাতে সক্ষম

হয়েছে। কিন্তু নিজের জীবনের গতিধারা পাল্টাতে সক্ষম হয়নি। বরং তারা জীবনের গোলক ধাঁধাতে এমনভাবে ঘূর্ণিপাকে খাচ্ছে যে, তা থেকে মুক্তির পথ তাদের কাছে নেই। এ এক আজব তামাশার কথা। তাদের ব্যাপারে এ কবিতাগুলো বড়ই যথার্থ ঃ

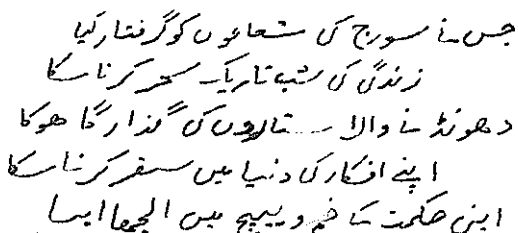

যারা সূর্যের আলোকে আপন মুঠোবদ্ধ করতে হয়েছে সক্ষম,
অথচ আজো জীবনের তিমিরতা কাটিয়ে নবপ্রভাত ঘটাতে রয়েছে অক্ষম।
যারা নক্ষত্রের গন্তব্যের পেয়েছে সন্ধান
কিন্তু এখনো নিজের হৃদয় আত্মার পায়নি সন্ধান।
নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘূর্ণিপাকে খাচ্ছে ঘূর্ণিপাক,
কল্যাণ-অকল্যাণের সিদ্ধান্ত নিতে এখনো অক্ষম।

মুক্তির পথ ঃ

আজ ইউরোপের মুক্তির পথ হল, তারা সাহসিকতার সাথে রূহানী ও আখলাকী দেউলিয়া হবার ঘোষণা দিবে এবং সঠিক ধর্ম ও নবীদের শিক্ষা গ্রহণ করবে। কারণ বিশুদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস ও নবীদের শিক্ষা তাদের জীবনে প্রাণ সঞ্চার করবে, তাদেরকে আল্লাহর জাত, সিফাত ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভেজাল ও সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করতে সক্ষম। এ ধর্মীয় বিশ্বাস ও তা'লীম তরবীয়ত তাদের অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত ও খোদাভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাদের দেমাগের আলো নিস্প্রভ করা ছাড়াই তাদের দিলকে আলোকিত ও উষ্ণ করতে সক্ষম। এ জীবনের পর ভিন্ন এক জীবনের চূড়ান্ত একীন সৃষ্টি করতে সক্ষম। সেখানে মানুষের ভাল-মন্দ প্রকাশ্য ও গোপনীয় কৃতকর্মের ফলাফল নজরে আসবে। সেদিনের হিসাব-নিকাশের ভয় ও নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব

কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি সৃষ্টি হবে। ফলে সে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যার ব্যাপারে একই রকম সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং একই রকম নীতি গ্রহণ করবে। এমন এক পূর্ণ মানুষের জীবন পেশ করতে সক্ষম যা দ্বারা মানুষ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ ও আদর্শ খুঁজে পেতে সক্ষম। যা অত্যন্ত বিস্তরিতভাবে এবং পূর্ণ আমানতদারীর সাথে ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত।

এর পাশাপাশি একটি বৃহৎ সংখ্যক মানুষের জীবনী সংরক্ষিত রয়েছে যারা বিভিন্ন সময় সভ্য দুনিয়াতে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তৎকালীন সময়ের বড় বড় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি পূর্ণ আমল করেছে। তারা ধন-দৌলত, দাপট ও প্রতিপত্তির কঠিন পরীক্ষার সময়ে ন্যায়-নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি। বরং তারা ন্যায়-নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের এমন মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিতে সক্ষম হয়েছে, যা থেকে বিন্দুমাত্র পদস্খলন ধ্বংস ও আত্মাহুতির নামান্তর। তাদের মাঝে ছিল স্বভাবের স্বাভাবিক গতিশীলতা এবং দিলের প্রশস্ততা। তারা খৃষ্টান পাদ্রী, বর্তমানে ইউরোপের দুনিয়া পূজারী ও ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীরা ইরানীদের মত আয়েশ বিভর নয়। আবার প্রচলিত দার্শনিকদের মত শুষ্ক এবং রোমান সৈনিকদের মত কঠিন ও নির্দয় মেজাজের নয়। আবার গ্রীকদের মত রঙিন মেজাজের ও নীতিহীনতায় অভ্যস্ত নয়। আবার অস্বাভাবিক বন্ধনমুক্ত অথবা কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। তারা জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্ববোধের পরিবর্তে মানবতাবোধ ও মানুষের দোস্ত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিল বিশ্বমানবতা তথা সৃষ্টির খেদমতের জযবা ও আগ্রহ। স্বার্থ পূজার পরিবর্তে ছিল নিঃস্বার্থ ও কুরবানীর শিক্ষা। জুলুম অত্যাচারের পরিবর্তে ছিল ন্যায় পরায়ণতার শিক্ষা। এমন যদি হয় তাহলে তাদের দ্বারা ইউরোপকে সকল রোগ ও মছিবত থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে। তাদের কাছে থাকবে সব সমস্যার সমাধান, সকল রোগের ওষুধ, সকল প্রশ্নের উত্তর। তারা ইউরোপকে শতশত বছর পিছনের দিকে নিয়ে যাবার পরিবর্তে এখন থেকেই জীবনের গতি ও পথ পাল্টে দিবে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, তাদের শিল্প ও টেকনলোজি, তাদের সকল উপায়-উপকরণকে তাদের জন্য ও বিশ্বমানবতার কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করবে। তারা ইউরোপকে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবর্তে গোটা বিশ্বের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার অগ্রদূত এবং রহমতের ফেরেশতা হিসেবে আবির্ভূত করবে।

হেদায়তের ঝর্নাধারা ঃ

উপরে বর্ণিত এসব শিক্ষা তার সকল শর্তসহ দুনিয়াতে খুব কমই পাওয়া যায়। শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন একমাত্র ঐশিগ্রন্থ যা এখনো কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়া নিজস্ব আকৃতিতে বিদ্যমান। এটাই হল ন্যায়-নিষ্ঠা ও বাস্তবতার মূল উৎস ও ঝর্ণাধারা। এ কুরআনের শক্তি এখনো মানুষের দিলে উষ্ণতা দান করতে সক্ষম। কুরআনের জ্ঞান-জিজ্ঞান ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এখনো বর্তমান যুগের চাহিদা পূরণ করতে এবং সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। এ কুরআন সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং আল্লাহর জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যময় হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের জন্য উপলব্ধি ও আমলযোগ্য। এ কুরআনের ভাষা এখনো জীবন্ত এবং এর শব্দার্থ ও ব্যাখ্যার জন্য কোন ইঙ্গিত বা ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদ্যার প্রয়োজন নেই।

মুহাম্মদ রাসূল (সাঃ) দুনিয়াতে একমাত্র নবী যার অনুসরণ করা যেতে পারে, তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করা যেতে পারে, সর্বকালে ও সর্বযুগে। তাঁর জীবনে ধনী-গরীব, দুর্বল-সবল, বাদশাহ-ব্যবসায়ী, ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, যুদ্ধরত সৈনিক ও আত্মসমর্পণকারী ও চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি, আনন্দিত ও বেদনাময়, সুস্থ-অসুস্থ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেরই জন্য পৃথক পৃথক আদর্শ ও আমলী হেদায়েত রয়েছে। আবার তিনিই একমাত্র নবী যার জীবনের সকল ঘটনা যা জনসন্মুখে বা নির্জনে কৃতকর্মসমূহ বা তাঁর রূহানী, আখলাকী, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা বিস্তারিতভাবে এবং পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যতার সাথে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে পারে। আবার সাথে সাথে তার সাহাবাদের ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা ও সম্পদের পরীক্ষার মাঝে তাঁর শিক্ষাকে সফলভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্যদিকে তাঁর আনীত শরীয়তের মাঝে এমন উসূল ও মূলনীতি রয়েছে এবং তার আনীত জীবনব্যবস্থার মাঝে এমন সীমারেখা ও নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছে যা পরিবর্তনশীল যুগে সাম্য ও ইনসাফভিত্তিক সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি গড়ে তুলতে সম্ভব। তার আলোক-রশ্মিতে বিশ্বমানবতা ও গোটা বিশ্ব পূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে সমষ্টিগতভাবে অগ্রসর হতে পারে।

শুধুমাত্র অহংকারই প্রতিবন্ধক ঃ

জীবনের এ ঝর্ণাধারা ইউরোপীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হাতের নাগালের বাইরে। কিন্তু তাদের ব্যর্থতার স্বীকৃতি প্রদানের উপর নির্ভর করছে তাদের মুক্তির পথ। আর এটাই মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ। যে মানুষ চিন্তার জগতে

'নেতৃত্ব দিতে পারে, সমাজে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম, রাজনীতিতে চলে যার কর্তৃত্ব, যে মানুষ গোটা জাতিকে ধ্বংস করতে পারে, গোটা দেশকে মাটির স্তূপে পরিণত করতে পারে, যে ব্যক্তি সারা বিশ্বের রূহানীয়ত শূন্যতা ও ক্বলবী অস্থিরতা ও দৈহিক কষ্ট-ক্লেশ এবং অর্থনৈতিক পেরেশানী দেখে অবিচল থাকতে পারে, সে নিজের ধর্মকে স্বহস্তে বলি দিতে পারে এবং বিশ্বমানবতার স্বরব ক্রন্দন দেখতে সক্ষম তদুপরি সে নিজের ভুলের ও নিজের দেউলিয়াপনার কথা স্বীকার করতে ব্যর্থ। এ মানুষ প্রেক্রিপশন পরিবর্তন করে রুগীকে শেষ করতে পারে কিন্তু কোন দক্ষ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া লজ্জার কারণ মনে করে। সুতরাং যাদের মানসিকতা এই যে, তারা সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদী হজম করে ফেলেছে, সৃষ্টিজগতের রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের পক্ষে কি সম্ভব তারা মরুআরবের এক মূর্খ নবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে? কারণ তিনি তো কাগজের উপর লেখার আর্ট সম্পর্কে জ্ঞাত নন বা তিনি তো লিখিত অক্ষর পড়তেও সক্ষম নন। তাদের এ অহমিকাবোধ এবং অহংকারের পরিণতি হল এই যে, মানুষ বংশানুক্রমে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করতে লাগল অন্যদিকে একটি ব্যাপক বিস্তৃত মছিবত গোটা মানব বিশ্বের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

এশিয়ার দেশগুলোর পরিণতি ঃ

এশিয়ার যে সব দেশ ইউরোপের পদানুসরণ করছে তাদের ভবিষ্যৎ ইউরোপ থেকে অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ তাদের বর্তমান ধর্মীয় অনুভূতি রূহানীয়ত ও নীতি-নৈতিকতার মাঝে ঐ শক্তি নেই যা তাদের খাহেশাতের বলগা ঘোড়ার মুখে লাগাম দিতে এবং তাদের মনের আশা-আকাঙ্খার সাথে সংগ্রাম সাধনা করতে সক্ষম হত। নবীগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও তা'লীম-তরবীয়তের যে ভাণ্ডার ঐ সব দেশসমূহে ছিল এবং যে শিক্ষাব্যবস্থা স্বীয় যুগে বড় বড় কল্যাণকর কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল, মানুষের দিল ও দেমাগ, মন-মস্তিষ্ক, আখলাক-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তা হাজার বছর অতিক্রম হবার কারণে এবং মানুষের অসতর্কতার কারণে স্বীয় শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেছে। নবীদের এ শিক্ষা ব্যবস্থা সে সব দেশের রীতি-নীতি ও আলেমগণের চুলচেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কারণে এ যোগ্য ছিল না যে তা মানবজীবনের গতি পাল্টাতে এবং বিশুদ্ধ রূহানীয়ত ও আখলাকী শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে এদের কাছে ইউরোপীয়দের মত এমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নাগরিকত্ববোধ ছিল না, যা তাদের জীবনে শৃঙ্খলা ও একাগ্রতা সৃষ্টি করবে, তাদেরকে সাধারণ স্তরের নীতিহীনতা ও বিশৃংঙ্খলা থেকে

ঊর্ধ্বে উঠাতে সক্ষম হবে। পশ্চাত্যের গোলামী তাদের মাঝে অসংখ্য আখলাকী ও সামাজিক খারাপী সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সমাজকে নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল ও অসার করে ফেলেছে। আবার অন্যদিকে বিশ্ব রাজনীতির কারণে আখলাক, তরবীয়ত ও মানসিক পরিবর্তন এবং ব্যক্তিত্ব গঠন ছাড়াই তাদের উপর স্বাধীন ও বিশাল রাজ্যের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আর এ কারণে অসংখ্য আখলাকী দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে প্রকাশ পেয়েছে। যে সব দোষ-ত্রুটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যমান ছিল তা বর্তমানে বিস্তৃত আকারে প্রকাশ পাওয়া শুরু করেছে। কালোবাজারী, অধিক মুনাফাখোরী তোষামোদী, ঘুষ, প্রতারণা, আত্মসাৎ, অনধিকার চর্চা ও সংকীর্ণতা, দ্রুত মালদার হবার নেশা, এবং এ কারণে সর্ব ধরনের অপরাধ করার প্রবণতা বর্তমান যুগের বহুল আলোচিত বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণে অসংখ্যা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

আসল রোগ ঃ

মূলত উল্লখিত বিষয়গুলো পৃথক কোন রোগ নয় এবং বরং এগুলো রোগের আলামত মাত্র। আর মূল রোগ হল জীবনের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা এবং জীবনকে উপভোগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। যখন জাতির মাঝে এ রোগ দেখা যায় তখন সে দেশ-জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। দেশ-জাতি গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভাই আপন ভাইকে হত্যা করতে, পিতা পুত্রের পেট কেটে নিজের উদর ভর্তি করতে অভ্যস্ত হয়। মমতাময়ী মা আপন সন্তানকে নিজের খাহেশাত পূরণের জন্য বিক্রি করে দিতে কষ্টবোধ করে না। রাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দেশকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে লজ্জাবোধ করে না। সুতরাং এ রোগের চিকিৎসা সহজ নয়। নিত্য-নতুন আইন-কানুন, দায়-দায়িত্ব কঠিন নেগরানী এসব ক্ষেত্রে মোটেই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সফলতার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টা কাজে আসছে না। কারণ তারা তাদের উদ্দেশ্য হাছিলের লক্ষ্যে একটু ভদ্রতা প্রদর্শন করে মাত্র। মূলত এসব কিছু দ্বারা মানুষের মন-মানসিকতা ও নৈতিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

চিকিৎসা শুধু একটাই ঃ

এসব রোগের চিকিৎসা শুধু একটাই। এছাড়া অন্য কিছু নয়। আর তা হল, আল্লাহর ভয়, আখেরাতের অনন্ত জীবনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। এ ভয় ও বিশ্বাস দুনিয়ার অতি পুরাতন কোন দর্শন, যাদুময় কাব্য এবং হৃদয়গ্রাহী ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা সৃষ্টি হয় না । এ দৌলত সব সময় নবীগণেই দান করে থাকেন এবং

বর্তমানেও তাদের ধন-ভাণ্ডার হতে অর্জিত হতে পারে। দুনিয়ার খনিতে বিভিন্ন প্রকার মহামূল্যবান হীরক খণ্ড ও বাজারে সব ধরনের ক্রেতা পাওয়া যাবে কিন্তু ঈমান-একীন এবং এ দ্বয়ের ফল শুধু নবীগণের দান-দাক্ষিণ্য হতেই অর্জিত হতে পারে। প্রতিটি দেশ বড় বড় দার্শনিক এবং উন্নতমানের নৈতিকতা শিক্ষা, জীবনকে সফলতাময় করে তোলা, মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে প্রতিষ্ঠিত করা, ত্যাগ ও কুরবানীর এবং আত্মত্যাগের গৌরবময় ঘটনাবলি দ্বারা পূর্ণ। ঐতিহাসিক জনসভা ও আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনে ঐসব ঘটনার আলোচনা করা এবং তা নিয়ে গৌরববোধ করা যেতে পারে। কিন্তু নবীদের শিক্ষা-দীক্ষাকে সংরক্ষণ করা জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করার নামান্তর। আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল এ শিক্ষাব্যবস্থা যেন ধ্বংস না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। আর লেখক, গবেষক, কবি সাহিত্যিকদের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।

নবুওয়তী শক্তি ঃ

বস্তুত জীবনের অত্যন্ত ভারী চাকা ঘুরাবার জন্য এবং জীবনকে নীতি-নৈতিকতার মূলনীতির উপর পরিচালনা করার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, সাধু সন্ন্যাসীদের পুষ্পসাদৃশ মিষ্টি কথা এবং দর্শন শাস্ত্রের গভীরতা যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য নবীদের নবুওয়তী শক্তির প্রয়োজন। কারণ এ নবুওয়তী শক্তি আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে শতাব্দী কাল ধরে হাঁটু কাদার ভিতর আটকে পড়ে থাকা গাড়িকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ নবুওয়তী শক্তি মানবতার গাড়িকে পূর্ণ শক্তি দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ঠিকানাতে পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এ নবুওয়তী শক্তি আজো পর্যন্ত তাঁর জীবিত ধর্ম, জীবিত গ্রন্থ ও তাঁর সংরক্ষিত শরীয়তের মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান এবং তা এখনো বিশ্বমানবতাকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত।

এশিয়ার দেশগুলোর সৌভাগ্য ঃ

নবুওয়তী সম্পদ ও শক্তি লাভের ক্ষেত্রে ইউরোপের থেকে এশিয়ার দেশগুলো অধিক নিকটে। ফলে তা থেকে উপকৃত হবার ব্যাপারে ইউরোপীয়দের থেকে তাদের পক্ষে অধিক সহজ। বস্তুতঃ নবুওয়তী শক্তি ও সম্পদে প্রতিটি মানুষের ঐরূপ অধিকার রয়েছে যেমন আরবদের, মধ্য এশিয়ার জাতিগোষ্ঠী, সালজুকী ও উসমানীয়দের ছিল এবং বর্তমান যুগের মুসলমানদের রয়েছে। এ নবুওয়তী শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন জাতির দয়ার পাত্র হতে হয় না আবার কারো সামনে লজ্জিত হতে হয় না, এ নবুওয়তী শিক্ষার উপর কোন দেশ-জাতির ইজারাদারী নেই এবং কেউ এর এজেন্ট নয়। প্রতিটি জাতি গোষ্ঠী সরাসরি তা গ্রহণ করে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারে।

প্রয়োজন শুধু উদারতার ঃ

একজন মাহবুব ও প্রিয় রোগীর সেবাকারী ব্যক্তি যে পরিমাণ দৌড়ঝাঁপ করে এবং এক্ষেত্রে সকল প্রকার গোষ্ঠীগত মানসিকতা পরিহার করে উদারতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয় এবং সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত মানসিকতা ও আঞ্চলিকতা কোন প্রকার বাধা হয়ে দাঁড়ায় না । ঠিক তদ্রূপ ঐ সব ব্যক্তিবর্গ বা জাতিগোষ্ঠী যারা বিশ্বের নেতৃত্বে সমাসীন এবং বিশ্ব মানবতার যে জাহাজে আরোহণ করে আছে তার নাবিকের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের জন্য ন্যূনতম দৌড় ঝাঁপ ও সীমারেখার মানসিকতা পরিহার করে অত্যন্ত উদারতা ও প্রশস্ত দিলের পরিচয় দিয়ে বৃহৎ জনগোষ্টির স্বার্থে কাজ করা উচিত। কারণ একটি জাতির সমস্যা একটি রোগীর সমস্যা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোন জাতি-গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের দায়-দায়িত্ব কোন রুগীর সেবা কারীর দায়-দায়িত্ব থেকে কোন কম নয়। কারণ একজন রুগীর সেবাকারী আত্মিয়ের জন্য সমুদ্রের বুক চিরে মতি সংগ্রহ করা এবং আকাশের নক্ষত্র নামিয়ে আনা বড় কিছু নয়। কিন্তু জাতীয় নেতৃবর্গের এত অসাধ্য সাধন করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন হল সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পরিহার করে অত্যন্ত উদার দিলের পরিচয় দেয়া।

আল কুরআনের উদাত্ত আহ্বান ঃ

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পবিত্র কুরআন যে ভাবে তৎকালীন জাতি গোষ্ঠীকে আহ্বান করে ছিল আজো বিংশ শতাব্দীর সকল জাতি গোষ্ঠীকে সেভাবেই আহ্বান করে ঘোষণা দেয়।

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۔ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাকে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে শান্তির রাস্তা প্রদর্শন করে এবং তাকে তাঁর অনুগ্রহে অন্ধকার ও তিমিরতা থেকে মুক্তি দিয়ে আলোক রশ্মিতে নিয়ে আসে এবং তাকে সত্যের পথ প্রদর্শন করে। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ১৫/১৬)

মজলুম মানবতা

চক্ষুশূল ঃ

ভারত বর্ষে প্রচলিত কাহিনীগুলো অনেক বড় বড় মর্মার্থ রাখে। এসব প্রচলিত কাহিনী শ্রবণ করে মনে হয় যে, এদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবনের বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বকে অতি সহজ ভাষায় এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করেছে। অথবা অত্যন্ত নিরেট বাস্তবতাকে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করাবার অসাধ্য সাধন করেছে। আমরা এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সাহায্যে জীবনের অসংখ্য বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারি।

শৈশবে যে সব কাহিনী আমরা শ্রবণ করেছিলাম এবং দেমাগের সাদা সিলেটে তা লুক্কায়িত রয়ে গিয়েছিল। তার একটি কোন মজলুম মহিলার হৃদয় বিদারক ঘটনা ছিল। ঘটনাটি ছিল এমন—

উক্ত মজলুম মহিলার সারা শরীর কোন কারণে কাঁটাবিদ্ধ হয়ে যেত। তার সতীন তার দেহের সব কাঁটাই বের করে দিত কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে সে চোখের কাঁটা বের করত না। এভাবেই রাত হয়ে যেত। আবার পরের দিন নতুন কাঁটাবিদ্ধ হত। আর সতীন সারাদিনে সকল কাঁটা বের করে দিত। কিন্তু চোখের কাঁটা বের না করে রেখে দিত। আমার ঘটনার এতটুকুই বলা প্রয়োজন।

আপনি যদি এ গল্প বা কাহিনী নিয়ে একটু চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে, অনন্তকাল থেকে মজলুম মানবতার সাথে এ আচরণই করা হয়েছে। তার সারা দেহে কাঁটা বিদ্ধ, কাঁটার আঘাতে তার দেহ চালনের মত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। কিছু মানব দরদী হাত ঐ কাঁটাগুলো বের করতে অগ্রসর হলেও চোখের কাঁটা বের না করে চোখেই রেখে দেয়। ফলে তার মুক্তির পথ অপূর্ণই থেকে যায়। আর এ কারণে পরের দিন সে কাঁটায় জর্জরিত হয়ে যায় এবং পুনরায় তার দেহ থেকে কাঁটা বের করার নতুন কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

কাঁটাবিদ্ধ মানবতা ঃ

বিশ্বমানবতা একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের আকৃতি ও অস্তিত্বের অধিকারীর মত। এ মানবতা মানব জীবনের সকল দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। তার সাথে দেহ, পেট ও দিল যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে দেমাগ ও রূহ। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে বালা-মুছিবত ও দুঃখ-বেদনা দুটোই রয়েছে। আর এগুলোই হলো তার দেহে বিদ্ধ কাঁটা যা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে রেখেছে।

ক্ষুধা, পিপাসা ও অনাহার, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবকে পেটের শূল বলা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এর দ্বারা মানবতা দুঃখ ও কষ্ট পায় এবং এটা বিশ্ব মানবতার জন্য অত্যন্ত বড় দুর্ভাগ্য ও লজ্জাজনক অধ্যায়। কারণ আল্লাহর অজস্র দান ও কৃপায় খাদ্যের কোন ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষের নাজায়েয স্বার্থ ও কর্তৃত্বের কারণে অথবা কোন রাষ্ট্রের শোষণমূলক মনোভাবের কারণে বিশ্ব জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ অনাহারে জীবনযাপন করছে এবং তারা তাদের জন্মগত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে দুঃখ প্রকাশ করা, সভা-সমাবেশ ও মিটিং মিছিল করা এবং এ অবস্থার বিরুদ্ধে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা স্বাভাবিক ব্যাপার ও মানুষের সঠিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এক্ষেত্রে নিন্দা জ্ঞাপন করা বা আশ্চর্য হবার কোন সুযোগ নেই।

মানুষের যেমন দেহ আছে এবং দেহের শীত গরমের অনুভূতি প্রদান করা হয়েছে। তাকে পোশাকের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ অধিকার পূরণের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা জমীনে পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং প্রয়োজন অনুপাতে পোশাক তৈরির সকল সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর কিছু মানুষের প্রয়াজনাধিক পোষাক ব্যবহার করা, অথবা আলমারীবদ্ধ ও গুদামজাত করে রাখার কারণে অথবা গৃহসামগ্রীকে জানদার মানুষের পোষশাকে আবৃত করে রাখার কারণে আজ জানদার মানুষ ঠাণ্ডা নিবারণের কাপড় অথবা লজ্জাস্থান আবৃত করার মত বস্ত্র পেতে সক্ষম হচ্ছে না। নিঃসন্দেহে এটা বড় জুলুমের কথা।

মানুষের দিল আছে এবং দিলের কিছু জায়েয খাহেশাত রয়েছে। আর সে খাহেশাত পুরা না হওয়া অত্যন্ত জুলুমের কথা। তার দেমাগ রয়েছে। এ দেমাগ এলেম থেকে মাহরূম হওয়া, দেমাগী শক্তি সঠিক কাজে ব্যবহার না হওয়া অত্যন্ত জুলুমের কথা এবং মানব জীবনের ধারাবাহিকতায় এটাকে বড় ত্রুটি মনে করা হবে। সুতরাং এ ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করা একজন সচেতন মানুষ এবং সঠিক চিন্তা ও পরিকল্পনাকারী জামাতের আখলাকী ও দ্বীনি, নীতিগত ও ধর্মগত অধিকার।

মানবীয় সভ্যতা সংস্কৃতি তখনই ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়, মানুষের রূহানীশক্তি, চিন্তাশক্তি ও দৈহিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটার তখনই সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়, যখন তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির করার মত কোন দানবীয় শক্তি গতি রোধ না করে। সাধারণত দেখা যায় যে, কোন বহিরাগত শক্তি ও জীবন উপকরণ মানব জীবনকে নিজেদের করতলগত করে নেয় এবং জাতি গোষ্ঠীকে বিভক্ত

করার কাজ নিজেদের অত্যাচারী হাতে তুলে নেই। এসব সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর কাছে সাধারণত জনগণের মানবীয় চাহিদাগুলো ম্লান হয়ে যায়, তাদের মন-মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো অকেজো হয়ে পড়ে এবং তারা স্ব-দেশে ও স্বীয় মাতৃভূমিতে জেলখানার কয়েদীদের মত মানবেতর জীবন যাপন করে। এ জন্য গোলামীকেও মানবতার জন্য একটি মছিবত বলে মনে করা হয়। আর তাই জীবনের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণের জন্য গোলামীর জিঞ্জির থেকে স্বাধীনতা লাভ করা অত্যন্ত জরুরি।

মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা ঃ

এ জন্য বলতে হয় যে, নিঃসন্দেহে দরিদ্রতা ও অনাহার, বস্ত্রহীনতা ও অজ্ঞতা এবং পরাধীনতা এসব কিছুই কণ্টক ও শূল সমতুল্য। এগুলো মানবতার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। সুতরাং এ থেকে মুক্তির পথ বের করা মানবতার গুরুত্বপূর্ণ খেদমত। কিন্তু মানবতার মূল সমস্যা, সকল দুঃখ-বেদনা ও রোগ-ব্যাধির উৎস কি এগুলোই? এগুলোই কি তার দেহের বিদ্ধ কাঁটা? এ কাঁটা বের হলেই কি তার দেহের বেদনা উপশম হবে? তার দিলে প্রশান্তি লাভ হবে এবং সুখ নিদ্রা যেতে পারবে? এতেই কি তার চোখের যন্ত্রণা লাঘব হবে এবং তার দিলের যাতনা দূর হবে? বরং আমরা দেখতে পাই যে, মানবতার সমস্যা এতেই শেষ হবে না। কারণ প্রতিটি মানুষের উদরপূর্তি খাবারের প্রয়োজন, অতঃপর তার পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন, অতঃপর তার সকল বৈধ খাহেশাত ও মানবীয় চাহিদা পূরণের উপকরণের প্রয়োজন এবং তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ সব প্রয়োজন মিটাবার পরেও দেখা যায় তাদের দেহে আরো কিছু বিষাক্ত কাঁটা বিদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং এ কাঁটা তার ভিতরে জ্বলন সৃষ্টি করছে। আর এ কাঁটা হল এমন এক সমাজব্যবস্থা যা জীবনে তো মৌখিক সফলতার গুণ অনেক কিন্তু তার ভিতরে যে বিষাক্ত কাঁটা বিদ্ধ হয়ে রয়েছে এ কারণে যে হরহামেশা চাপা কান্না ও অস্থিরতার ভিতরে জীবন যাপন করছে এবং অন্তর দহনে বিদগ্ধ হচ্ছে।

লোভ-লালসা ঃ

মানুষ যদি নিজের পেট ভরে খেয়ে এবং তার বিবি-বাচ্চারা ও অধিনস্তদের খানা-পিনা, লেবাস পোশাক ও অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনাদি পূরণ করে আত্মতৃপ্ত হত তাহলেও কোন কথা ছিল না। কিন্তু আসল বিষয় হল তার বাহ্যিক পেট ছাড়া ভিন্ন আরেকটি কৃত্রিম পেট রয়েছে। আর তাহল লোভ-লালসার পেট। এ

পেট জাহান্নামের মত 'আরো চাই' 'আরো চাই' 'হাল মিন মাযীদ' 'হাল মিন মাযীদ বলে চিৎকার করে। মানুষ টাকা পয়সা, অর্থ সম্পদের প্রতি আসক্ত। তবে এ দ্বারা তার প্রয়োজন নিবারণ হয় এ জন্য নয়। ফলে তাকে মোটা অংকের বিত্ত সম্পদ আত্মার প্রশান্তি দিতে পারে না। অর্থের প্রতি তার অহেতুক নেশার কারণে যেকোন বড় ধরনের অপরাধ অত্যান্ত স্বাভাবিক ভাবে করতে সক্ষম। ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারী ও অধিক মুনাফাখোরী এ মানসিকতার ফসল মাত্র।

দুর্নীতির মূল কারণ ঃ

যদি দুনিয়ার নীতি-নৈতিকতার ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যায়ন করা হয় এবং এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, এবং নাগরিক সমস্যাগুলোর মৌলিক কারণ উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এর গভীরে মানুষের বৈধ চাহিদার হাত অত্যন্ত কম রয়েছে। বরং তার গভীরে সাধারণত কাল্পনিক চাহিদা ও খাহেশাত পূরণের কালো হাত দেখা দিবে। সর্ব যুগেই নাগরিক জীবনে নতুন নতুন সমস্যা এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নিত্য নতুন সংকট সৃষ্টি হয়। এসব কাল্পনিক চাহিদা মানুষকে জুলুম- অত্যাচার, আত্মসাৎ, প্রতারণা, জবর দখল, ঘুষ, মজুদদারি কালোবাজারির মত অসংখ্য অনৈতিক কাজে উৎসাহিত করে। এর ফলে বড় বড় রাষ্ট্র ভেতর থেকে অসার, অকেজো ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বর্তমানেও যদি সমকালীন সমস্যা ও অভিযোগগুলোকে খতিয়ে দেখা হয় তাহলে স্পষ্টই দেখা দিবে যে, বর্তমান যুগের সমস্যা, সংকট ও অস্থিরতার মূল কারণ দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী মানবীয় মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে অথবা তাদের বৈধ চাহিদা পূরণ হচ্ছে না । দেশের অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন নয়। বরং যদি ইনসাফের দৃষ্টিতেই দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এসব অন্ন-বস্ত্রহীন লোকেরা কারো সুখ নিদ্রার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বরং মানুষের সুখনিদ্রার পথে তারাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে যাদের উদর পূর্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের দিল ও দেমাগ, মন-মস্তিষ্ক মাল-দৌলতের দ্বারা কখনো পূর্ণ হয় না। বৈধ চাহিদার নামে কলংক এঁকেছে। এর তালিকা খুব বেশি নয়। মূলত সকল বিগাড় ও খারবীর মূল উৎস হল মানুষের কাল্পনিক জরুরত ও চাহিদা। আর এর তালিকা সর্বদা বৃদ্ধি হতে থাকে। আবার কখনো এর তালিকা এত লম্বা হয় যে, একটি শহর বা একটি দেশের সম্পদ একজন মানুষের কাল্পনিক চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট হয় না।

অশান্তির মূল কারণ ঃ

বর্তমান বাজার মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, পণ্যসংকট ও বাজার নিয়ন্ত্রণহীন কেন? দেশের অধিকাংশ অন্ন-বস্ত্রহীন হবার কারণে? বরং মানুষের মালের নেশা বৃদ্ধি হওয়াই এর মূল কারণ। অতি দ্রুত মালদার হবার নেশা উম্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মানুষের মাঝে স্বল্পে তুষ্টির মানসিকতা দুর্লভ হয়ে গেছে। অহংকার, লৌকিকতা পদমর্যাদার লোভ, বর্তমানে জনসাধারণের দিল ও দেমাগে, অস্থি-মজ্জাতে গেঁথে গেছে।

জীবনের শান্তি ঃ

আজকে যে বিষয়টি মানুষের জীবনকে আজাবময় ও এ দুনিয়াকে জাহান্নামে পরিণত করেছে এবং এক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে তা হল অত্যন্ত বর্ধিতহারে ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, জুলুম পর্যায়ের মুনাফাখোরীর প্রচলন। কিন্তু এসব অপরাধে যারা জড়িত তারা অন্ন-বস্ত্রহীনতার পেরেশানীতে বাধ্য হয়ে এমন করছে এমন নয়। বরং এগুলো এমন এক শ্রেণীর মানুষ করছে যারা পেট ভরার পরেও খাদ্য গুদামভর্তি করে রেখেছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত লেবাস-পোশাক আলমারীবদ্ধ করে রেখেছে এবং জরুরতে যেন্দেগী দ্বারা ঘর ভর্তি করে রেখেছে। হাজার হাজার এসব দুর্নীতিগ্রস্তদের একজনকেও পাওয়া যাবে না যারা অন্ন-বস্ত্রহীন কোন মানুষ। যারা এসব অপরাধ করে থাকে তারা হল মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল শ্রেণীর মানুষ। তাদের কাছে জরুরি সামানের কোন অভাব নেই এবং এসব অপরাধে জড়িত হবার মত কোন বাধ্যকতা নেই।

বাস্তব কথা হল এই যে, মানুষের স্বাভাবিক জরুরত এবং আনুষাঙ্গিক প্রয়োজন মিটানো মুশকিল কিছু নয়। সারা দেশে প্রতিটি মানুষ পেট ভরার মত খাদ্য, প্রয়োজন মত বস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে সক্ষম। কিন্তু কোন বিশাল রাষ্ট্র এবং কোন উন্নত ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি জনপদের কাল্পনিক জরুরত পুরা করতে সক্ষম হবে কি? কোন একজন মানুষের কৃত্রিম পেট ভরতে সক্ষম হবে কি? কারণ মানুষের এ কৃত্রিম ক্ষুধা সমগ্র মানবতার রিযিক হরণ করেও তার ক্ষুধা নিবারণ হয় না। সুতরাং যখন বাস্তব সমস্যা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই বরং প্রশ্ন হল মানুষের কাল্পনিক জরুরত নিয়ে। যেখানে বৈধ চাহিদার কোন রোগ নয় রোগ হল কৃত্রিম রোগের। সেখানে এমন কোন অর্থনৈতিক দর্শন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নেই যা মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করতে সক্ষম। বরং তারা শুধু মানুষের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে চায়, যা মানুষের বস্তুবাদী অনুভূতিকে মধ্যমপন্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে আরো আগুন

লাগিয়ে দেয়। এমন অর্থব্যবস্থা কি কোন সমাজকে অভ্যন্তরীনভাবে আস্বস্ত করতে এবং বর্তমান সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হতে পারে কি?

মানবজীবনের সংকট ও তার কারণ ঃ

যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে ঘুষ-দুর্নীতি, কালোবাজারি অধিক মুনাফাখোরী এবং এমন অসংখ্য নৈতিক অধঃপতন ও অপরাধ মানব জীবনের মৌলিক সমস্যা নয়। বরং যে মানসিকতা এসব অপরাধে ও দুর্নীতি করতে বাধ্য করে এগুলোই হল আসল ও মৌলিক সমস্যা। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন মানসিকতার পরিবর্তন না হবে ততদিন এসব রোগের পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব নয়। কারণ যদি ঐসব অপরাধের এক দরজা বন্ধ করা হতো তাহলে আরো দশটি দরজা খুলে যাবে। কেননা মানুষ নিজের উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য অসংখ্য দরজা সৃষ্টি করে রাখে। তাই যদি তার মানসিকতার গভীর পরিবর্তন সাধিত না হয় তাহলে রাস্তার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কোন লাভ নেই। কারণ মাকসুদ হাছিলের জন্য অসংখ্য হিলা-বাহানা তার সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং এগুলো দ্বারা সে তার মাকসুদ হাছিল করে নেয়।

বর্তমান জীবনের মূল খারাপী হল পুরো সমাজের অস্থি-মজ্জা, মন-মানসিকতা স্বার্থপূজারী ও মতলব পূজারী হয়ে গেছে। ফলে সমাজের যে কোন ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বড় বড় দুর্নীতি করতে সক্ষম। যদি তাকে কোন দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাহলে সে আমানদারীর পরিবর্তে লাগামহীন খেয়ানত করতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। যদি সে কোন সরকারী প্রতিনিধি হয় তাহলে সে নিজের অতি নগণ্য স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে লজ্জা বোধ করে না। সে অন্যের সুখের ঘর ভেঙ্গে নিচের সুখের সংসার গড়তে ব্যস্ত থাকে। যদি সে কোন অধিনস্ত কর্মচারী হয় তাহলে সে কাজে ফাঁকি দেয়, অলসতা করে এবং দায়িত্বহীন হয়। সে নিজের স্বার্থের কারণে বা কোন ব্যক্তিগত ক্রোধের কারণে এক ঘন্টার কাজ অনায়াসেই এক মাস লাগিয়ে দিতে সক্ষম। আর অতি সহজ বিষয়কে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখতে দ্বিধাবোধ করে না। এভাবে সে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রের গতিশীলতাকে ব্যর্থ করতে সিদ্ধহস্ত। যদি সে রাষ্ট্রের ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে সে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও পছন্দনীয় লোকদের সুযোগ সুবিধা প্রদান, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ব্যক্তি ও খান্দানী স্বার্থের জন্য স্পষ্টই অনিয়মে অভ্যস্ত হয়ে দেশ ও জাতির বিরাট ক্ষতি সাধন করে। যদি সে ব্যবসায়ী হয় তাহলে কালোবাজারি ও অধিক মুনাফাখোরীর মাধ্যমে অসংখ্য গরীবের ক্ষুধাতুর বিনিদ্র রজনী যাপন করতে বাধ্য

করে। ফলে অভুক্ত গরীব-দুঃখী ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে থাকে। যদি সে টাকা পয়সার কারবারী হয় তাহলে সুদখোরী ও মহাজনী ব্যবসার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ঋনগ্রস্ত অসহায় মানুষকে সুদী ঋণের জালে জড়িয়ে কানা কড়ির ফকির বানিয়ে দিতে অভ্যস্ত।

স্বার্থ পূজারী ঃ

ব্যক্তি থেকেও অধিক ভয়ংকরভাবে দলীয় স্বার্থের ভূত গোটা জাতির উপর সওয়ার হয়ে আছে। রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় স্বার্থ ও দলীয়করণে ব্যস্ত। ইউরোপ-আমেরিকার গণতন্ত্রের উপর জাতিগত স্বার্থের ভূত সোয়ার হয়ে আছে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ-জাতি-গোষ্ঠীকে তারা তরুলতার মত পদদলিত করে পিষে ফেলছে। এ স্বার্থ পরায়ণতা গোটা বিশ্বকে বাণিজ্যকেন্দ্র বা কামারের চুল্লিতে পরিণত করে রেখেছে। তারা সারা বিশ্বকে একটি রণক্ষেত্রে পরিণতি করে রেখেছে। এ ধরনের জাতীয় স্বার্থের কারণে বড় অনিয়ম ও নিয়ম ভঙ্গকে মেনে নেওয়া হচ্ছে। তাদের সামান্য ইঙ্গিতে লক্ষ নিরপরাধ লোককে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। এক জাতিকে অন্য জাতির গোলামে পরিণত করা হয়। গরু-ছাগলের মত এক জাতিকে অন্য জাতির কাছে বিক্রয় করা হয়। কোন ইউনাইটেড দেশকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়। ইউরোপের এ জাতীয় স্বার্থ প্রথমে আরবদেরকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। অতঃপর তাদেরকে আবার সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়ে ছিল। অতঃপর এ জাতীয় স্বার্থের নামে ক্ষুদ্র সিরিয়াকে চারটি ভুখণ্ডে বিভক্ত করে দিয়েছে। অতঃপর এই ইউরোপেই ইয়াহুদিদেরকে ইয়াহুদী রাষ্ট্রের শ্যামল উদ্যান দেখিয়ে ছিল। বর্তমানে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে যা কিছু ঘটছে তা সবই বৃটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের কারণে। ভারতবর্ষে শত বছর যাবত যা কিছু ঘটেছে এবং পরবর্তীতে এ শান্তিপ্রিয় দেশকে কশাইখানাতে পরিণত করতে হয়ত বৃটেনের সরাসরি জাতীয় স্বার্থের দখল ছিল অথবা তার সৃষ্টিকৃত নিকৃষ্টতম ব্যক্তি স্বার্থের বিষাক্ত ছোবলে শত বছর যাবত আক্রান্ত বিষ প্রতিক্রিয়ার বিষফল ছিল। পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতি ও পশ্চিমা রাজনীতির ধ্যান-ধারণায় লালিত ব্যক্তি স্বার্থের কারণে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের শান্তিপ্রিয় লোকগুলোকে স্বার্থান্ধ ও স্বার্থ পাগল করে তুলেছিল। ফলে এদেশের মানুষ এমন হিংস্র হয়ে উঠেছিল যে, তাদের কার্যকলাপ দেখে পশুদের লজ্জাবোধ হত এবং মানুষখেকো হিংস্র হায়েনার মাথা লজ্জায় নত হয়ে যেত। আর আগামীদিনের ঐতিহাসিকের পক্ষে ঐ সকল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করতে অত্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব পোষণ করতে হবে।

স্বার্থের পরিণতি ঃ

আবার এ স্বার্থপরতা সারা দুনিয়াতে এবং গোটা বিশ্বের সর্বস্তরের নাগরিকদের মাঝে এমন এক মানসিকতা সৃষ্টি করেছে যার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এ মানসিকতার কারণে মানুষ আপন অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগামী থাকে কিন্তু স্বীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে থাকে অত্যন্ত অবহেলাকারী ও টাল-বাহানাকারী। এ মানসিকতা ও এ ধরনের চরিত্র সারা দুনিয়ার ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও পেশাগত জীবনে এক বিরাট অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছে। কারণ প্রত্যেকেই নিজের অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বচেষ্ট কিন্তু অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শনকারী। যদি গোটা বিশ্বের উপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক নজর রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, গোটা বিশ্ব অধিকার আদায়কারীদের এক মহা সমাবেশ। এ সমাবেশের প্রতিটি মানুষের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে অধিকার আদায়ের শ্লোগান, কিন্তু তাদের কেউ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়, ফলে সেখানকার সমস্যা ও পেরেশানীকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ঐ সব সমস্যা ও পেরেশানী মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়।

আমরা এসব স্বার্থপরায়ণতার বিরুদ্ধে যতই চিৎকার করি না কেন, এবং এ কারণে আমাদের প্রতিনিয়ত জিন্দেগীতে বিভিন্ন রকমের পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয় না কেন, এটাই হল একটি স্বাভাবিক নিয়ম। কারণ বর্তমানে এ কথা বিশ্বাস করা হচ্ছে যে, এ জীবনের পর আর কোন জীবন নেই এবং জাগতিক সুখ-শান্তি, আমোদ-প্রমোদ ছাড়া অন্য কিছুকে অকল্পনীয় মনে করা হয় এবং আমাদের সকল সাহিত্যকর্ম, দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশ উক্ত বাস্তবতার কথা সর্বাধিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে চেষ্টা করে থাকে এবং এ দৃষ্টিভঙ্গির নমুনাকে সনদ ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং মৃত্যুর পর আখেরাতের সকল ধ্যান-ধারণাকে নিঃশেষ করার চেষ্টা চলছে। নীতি-নৈতিকতার মূল্যায়ন এবং জীবনের অন্যান্য মানবীয় উন্নত গুণাগুণ ও চিরসত্য বাস্তবতা খাঁটি জাগতিক ও মানবিক চাহিদার জন্য স্থান খালি করে দিচ্ছে। পেট ও দৈহিক চাহিদা সম্প্রসারিত হয়ে জীবনের ব্যাপকতাকে পরিবেষ্টিত করে ফেলেছে এবং মানব জীবনের অন্য সকল বাস্তবতাকে দৃষ্টির আড়াল করে দিয়েছে। বাস্তব সত্য কথা হল, এ সমাজের মানুষ কেনই বা স্বার্থপরায়ণ হবে না? আর কেনই বা তারা এ জীবনের সুখ-শান্তি ও আমোদ-প্রমোদকে দূরে সরিয়ে রাখবে? কারণ যখন এক পরাক্রমশালী স্বত্তা তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে এ একীন ও বিশ্বাস

তার সামনে না থাকে, তার ভয়ভীতির প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাস স্থাপন না হয় তাহলে তো সে আমোদ-প্রমোদ বিলাসী জীবনের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব করবে না। বরং যখনই সুযোগ আসবে তা গনিমত মনে করে গ্রহণ করবে।

আবার যখন বস্তুবাদী রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবনকে কোন এক নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পরিবর্তে সংকীর্ণ কোন গোষ্ঠী বা জনপদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়, তাদের সামনে থেকে ঐ সব দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয় যা মানুষকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের দিকে এবং বিশ্বময় দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আহ্বান করে। সুতরাং এখন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক স্বার্থপরায়ণতার লাগামকে টেনে ধরে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর ঐ সব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন প্রকার জায়েয না জায়েয থেকে বাঁচতে সক্ষম হচ্ছে না।

এ স্বার্থ পরায়ণতা ও মতলব পূজারী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার জন্মগত রোগ। যতক্ষণ এর চিকিৎসা না হবে ততদিন এ সব বাহ্যিক সংস্কার ও উন্নতি খুব বেশি ফলপ্রসূ হবে না। রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন, স্বয়ং সম্পূর্ণ হোক বা পরাধীন হোক যতদিন পর্যন্ত এ স্বার্থপরায়ণতা ও মতলব পূজার পেতাত্মা আমাদের সমাজে বিরাজমান থাকবে, মাল-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ জাতির ঘাড়ে সোয়ার থাকবে এবং দায়িত্ব সচেতনতা মানুষের দিল থেকে বের হয়ে যাবে এবং সমাজ জীবনের চিন্তা-চেতনা যখন বেশি থেকে বেশি মজা লুটা, আনন্দ-ফূর্তি করা এবং প্রয়োজনীয় জরুরত পুরা করার এবং খাহেশাত পুরা করার প্রতি অধিক হারে আগ্রহী হবে তখন মৌলিকভাবেই ঐ সমাজ জীবন বাস্তব সুখ-শান্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ থেকে মাহরূম হতে বাধ্য।

সমাজের গোপন রোগ ঃ

আমাদের প্রত্যহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, সমাজ এক কৃত্রিম ধোঁকার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এ ধোঁকা হল এই যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও উন্নত লেবাস পোশাকের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করছে, বর্তমান সমাজে অনাহারী ও বিবস্ত্রলোকের সংখ্যা কমে গেছে। বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা লাঘব হয়েছে, শিক্ষাব্যবস্থা সার্বজনীন হচ্ছে, অর্থনীতির নিত্যনতুন দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে কিন্তু এ সমাজ গোপনীয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এ দুরারোগ্য গোপন রোগ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেতর থেকে খুকলা ও অসার করে

ফেলেছে। কারণ যখন জুলুম ও বেইনসাফী মানুষের দিলে বাসা বাঁধবে তখন বাহ্যিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যতা দূর করলেই দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে না। কেননা অর্থনৈতিক সমস্যা ছাড়া সমাজে অসংখ্য সমস্যাও রয়েছে। অসংখ্য জুলুম ও অত্যাচারের ক্ষেত্র রয়েছে। ঐ সকল ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে থাকে, তাদের অধিকার গ্রাস করে ফেলে, ন্যূনতম তাকে পেরেশান করার সকল প্রকার আয়োজন হয়ে থাকে। তাই দিল থেকে যদি জুলুম-অত্যাচার ও বেইনসাফী দূর না করলে এবং স্বার্থপরায়ণতার মানসিকতা দূর না হলে রাষ্ট্রীয় আইন ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা জুলুম- অত্যাচার, বেইনসাফ ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়।

প্রাচুর্যতা ও উন্নতির চাবি ঃ

বর্তমান এশিয়ার যে সকল রাষ্ট্র নতুন নতুন স্বাধীনতা লাভ করেছে বা যে সকল রাষ্ট্র নতুন নতুন স্বাধীনতা লাভ করতে যাচ্ছে তারাও এ বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে রাজি নয় যে, দেশের প্রাচুর্যতা ও জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম ও উপায়-উপকরণ অর্জনের মাঝে সীমাবদ্ধ রয়েছে এমন নয়, বরং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি হল, যে সকল উদ্দেশ্যে এসব উপায় উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সঠিক হওয়া এবং এ গুলোকে সাম্য-সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আন্তরিক হওয়া। আর এ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কোন মেশিন বা রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। আর যদি জীবন ধারণের উপকরণ সামগ্রীর আধিক্য এবং দেশের বাহ্যিক নিয়ম-শৃঙ্খলা দ্বারা বাস্তব প্রাচুর্যতা, শান্তি নিরাপত্তা এবং আত্মার প্রশান্তি লাভ হয় তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকার মত সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও আত্মীক প্রশান্তির মনোরম উদ্যানে পরিণত হত এবং তা হত দুনিয়ার বুকে জান্নাতের নমুনা। কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত যে, এসব রাষ্ট্র সমূহের জনগণ সঠিক শান্তি ও নিরাপত্তা লাভে ধন্য হয়নি। সেখানকার অভ্যন্তরীণ সংকট ও সমস্যাবলি কোন গোপনীয় বিষয় নয়।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঠিকতা, দৃষ্টিভঙ্গির সুস্থতা, ইনসাফ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিকতার উৎসই হল সঠিক ও শক্তিশালী নীতিবোধ, আখলাক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। কারণ এগুলো মানুষের দেহের উপর যেমন রাজত্ব করে তেমনি মানুষের দিলের উপর রাজত্ব করে। আর এর মাধ্যমেই মানুষ নিজের খাহেশাত ও রিপুর তাড়নাকে সংবরণ করতে সক্ষম হয়। এ ধর্মীয় অনুভূতি তার

রূহানী শক্তি দ্বারা মানুষকে মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধর্মীয় অনুভূতি মানুষকে ক্ষণস্থায়ী ও মরণশীল জীবনের পরিবর্তে এক অনন্ত ও চিরঞ্জীব জীবনকে তার সামনে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলে। ফলে সে ঐ চিরন্তন জীবনের কল্যাণের আশায় এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে ভারসাম্যতা রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জীবন ধারণ করতে উৎসাহিত করে। ফলে তার সামনে খানা-পিনা, আরাম-আয়েশ, ঘুম-নিদ্রা, লেবাস, পোশাক, ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এবং ধন-দৌলত, ইজ্জত, সম্মান অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং মানবীয় চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। এ ধর্মীয় অনুভূতি মানুষকে মানবীয় চাহিদা বুদ্ধিমত্তার সাথে পূরণ করা ছাড়াও তাকে মানুষ ও জীবন সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা প্রদান করে। তার সামনে মানব জীবনের উন্নত ও মহৎগুণ তুলে ধরে। এ সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে স্বার্থ পরায়ণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম, যা দ্বারা আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাজনীতি কলুষিত হয়ে আছে।

নিঃসন্দেহে পুণ্যময় ঐ হাত যা মজলুম মানবতার মুক্তির জন্য এবং মানবদেহে যে কাটা বিদ্ধ হয়েছে তা বের করার জন্য অগ্রসর হয় কিন্তু তাদের স্মরণ থাকা দরকার, যে চক্ষুশূল বের করা ছাড়া তার সুখ নিদ্রা এবং আত্মিক প্রশান্তি লাভ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মহৎ উদ্দেশ্য। দেশকে দারিদ্রমুক্ত করা অনাহার ও বস্ত্রহীনতার অভিশাপ থেকে জাতিকে নাজাত দেওয়া, অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দূর করা এবং দেশের সকল নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন উপকরণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কল্যাণকর ও জনহিতৈষী কাজ। আর যারা এ সকল কাজে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে তারা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। কিন্তু তাদের এ সকল কাজ অসম্পূর্ণ মনে করা উচিত। কারণ যদি তা দ্বারা মানুষের আত্মিক প্রশান্তি ও চক্ষুশীতলতা লাভ হয় না, যদি তা দ্বারা মানুষ খোদাভীরু না হয়, এবং যদি সে দুর্নীতিমুক্ত না হয়। যদি তা দ্বারা মানুষের মাঝে দায়িত্ব সচেতনতা এবং কর্তব্য পালনে যত্নবান হবার মানসিকতা তৈরি না হয়, যদি তার দৃষ্টিভঙ্গি উদরপূর্তি ও ফ্যাশনপূজারী থেকে মুক্ত না হয় এবং যদি সে বিশ্বমানবতার কল্যাণে আত্মোৎসর্গকারী না হয়, যদি তার মাঝে উদারতা ও সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি .. এবং সৎসাহস সৃষ্টি না হয়। যদি জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু ও বিলাসিতার মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম না হয়, যদি পরস্পরের মাঝে ইনসাফভিত্তিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং যদি সে নিজের নফসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম না হয়।

অসংখ্য বার মানব দেহে বিদ্ধ কাঁটা বের করার জন্য মানবদরদী কিছু হাত অগ্রসর হয়ে ছিল কিন্তু প্রতিবারই সে হাত চক্ষুশূল বের করার পূর্বেই রাত হয়ে গিয়েছিল। কোন দেশের জোয়ান ছেলেরা জীবনবাজি রেখে এবং দেশের তরে আত্মোৎসর্গ করে দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়ে ছিল, আবার কোন দেশের বীরত্ব পূর্ণ লোকেরা সে দেশে জালেম স্বৈরশাসকের রাজসিংহাসন উল্টে দিয়ে তার ক্ষমতাচ্যুৎ করতে সক্ষম হয় এবং সে দেশে গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দিলের অশান্তি দিলেই রয়ে গেছে। দেশের আমলা ও শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিধান এবং রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি রাষ্ট্রের মন মানসিকতার মাঝে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এখনো পর্যন্ত বেশ কিছু দেশে অর্থনৈতিক সমতা আনার জন্য সংগ্রাম ও আন্দোলন চলছে কিন্তু মানুষ পেটের কাঁটা দেখতে সক্ষম হচ্ছে তবে তারা চক্ষুশূল দেখতে রাজি নয়।

তাই বিশ্ব মানবতা আজ ফরিয়াদ করে, মিনতিভাবে আহ্বান করছে যে, রাত্র আগমনের পূর্বেই তার দেহের কাঁটা বের করার সাথে সাথে যেন তার চক্ষুশূল বের করা হয় এবং যাতে সে প্রকৃত সুখ, দীর্ঘস্থায়ী প্রশান্তি এবং ভারসাম্য জীবন লাভে ধন্য হয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিন্তু সাংস্কৃতিক গোলামী

আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকিত যে, আপনাদের সুনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের সাথে কথা বলার সুযোগ লাভ হয়েছে। আমার মত একজন শিক্ষার্থী যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রাখে এবং সে তার প্রিয় বন্ধু-বান্দব ও স্নেহ ভাজনদের সাথে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে এ ধরনের সুযোগ তার জন্য অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ বলে বিবেচিত হবে। আপনাদের জন্য এ সুযোগ দুলর্ভ না হতে পারে কিন্তু আমার জন্য এ সুযোগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু বটে। কারণ আমি একদল শিক্ষিত শ্রেণীর ও আমার স্নেহভাজন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলোচনা করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছি।

পূর্ব-পশ্চিমের পরিচয় ঃ

আপনাদের জানা থাকতে পারে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে আমাদের প্রাচ্যের দেশগুলোর পরিচয় ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। মূলত পাশ্চাত্য সভ্যতা ঐ শতাব্দীর শুরুলগ্নেই প্রাচ্যের দেশগুলোর দিকে অগ্রসর হবার এবং তাকে কিছু দেবার যোগ্যতা অর্জন করে। আর সে সময়ই ইউরোপ থেকে অন্ধকার যুগের– যাকে Darkness বলা হয়ে থাকে– তিমিরতা দূরীভূত হয়ে একাকি পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে পথ চলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে অগ্রসর হবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এরপরই ইউরোপ প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে। উল্লেখ্য যে, ইতিঃপূর্বে উসমানীয় খেলাফতের দখলে থাকা কিছু আরব দেশের দিকে ইউরোপের কোন কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ছিল না। মূলত পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে প্রাচ্যের দেশগুলোর তখনই পরিচয় ঘটে যখন মিশর ও ভারতবর্ষ সরাসরি পরাক্রমশালী ইউরোপ জাতির করতলগত হয়ে পড়ে। মিশর, ভারত ও তুরস্ক সে সময়ে শুধুমাত্র যে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে এমন নয় বরং বিভিন্ন দিক থেকে তৎকালীন যুগের গোটা বিশ্বে তাদের এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

ভারতবর্ষ

ভারত বর্ষের এ জন্য গুরুত্ব ছিল যে, এ উপমহাদেশ এক বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভূমি ছিল। এখানে এক বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এখানে তারা অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিল। তারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। তাদের মেধা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অধ্যাবসায় এবং যোগ্যতা দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। ১৮৫৭ সালে যখন ভারতবর্ষে পরিপূর্ণ ইংরেজ রাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্তে সেখানে নিময়তান্ত্রিক ও একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন মনে করা হচ্ছিল যে, এখন ভারতবর্ষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দখলে থাকবে।

মিশর ঃ

মিশরের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, মিশর আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেখানে ছিল আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। সে দেশের কবি, সাহিত্যিক, উলামায়ে কেরাম ও সে দেশের মুদ্রিত কিতাবসমূহকে মুসলিম বিশ্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখত।

তুরস্ক ঃ

তুরস্ক সম্পর্কে আমাকে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কারণ তুরস্ক ছিল উসমানীয় খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, যোগ্যতাপূর্ণ ও দুঃসাহসী জনগোষ্ঠীই বসবাস করত। ফলে তারা দুনিয়ার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

এ তিন রাষ্ট্রের সাথে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয় ঘটে তখন তা ছিল তাদের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। এ ঘটনাকে আপনারা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বলতে পারেন। বরং এটাকে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দু'টোই বলা যেতে পারে। দুর্ভাগ্য এ জন্য যে, এ তিনটি দেশ কাছাকাছি একই সাথে ইংরেজ সম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতবর্ষ তো সরাসরি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের করতলগত হয়। আর মিশরে ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব ও ঋণ উসুলের নামে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তাদের প্রতিনিধি দ্বারা কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তুরস্কে সরাসরি যদিওবা কোন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তদুপরি সেখানে ইউরোপীয় রাজনীতির পূর্ণ অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য আমরা বলতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে প্রাচ্যের পরিচয় বৃটিশদের মাধ্যমে হয়েছিল। আর সৌভাগ্যক্রমে আমরা আজ এদেশেই জমায়িত হয়েছি। আর এ কারণেই আজকের ঐতিহাসিকগণ বৃটিশদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে বাধ্য যে, প্রাচ্য সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৃটিশদের মাধ্যমে এবং তাদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম নিজেদের পশ্চাদপদ ও দুর্বলতার বিষয় উপলব্ধি হয়। আর এ ঘটনা ঘটেছিল

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যমাংশের দিকে। আর এরপরেই আমাদের দেশগুলোতে স্বাধীনতার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, যা আপনাদের অজানা নয়। অতঃপর প্রাচ্যের প্রায় সকল দেশেই পাশ্চাত্যের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। তবে আমি এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করছি এ জন্য যে, এখানে সমবেত অধিকাংশই ভারত উপমহাদেশের সাথে সম্পৃক্ত। পরাধীনতার সে যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তা শেষ হবার প্রয়োজন ছিল। কারণ পরাধীনতা হল জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার নাম। কারণ এটা গ্রহণযোগ্য বিষয় যে, সাত সমুদ্র পারের কোন জাতি এসে এক সদা উর্বর ও বিশাল বিস্তৃত রাজ্যের উপর সে দেশের নাগরিকদের মতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তা হতে পারে না। এ এক অনধিকার চর্চা, যা জন্মগত অধিকার ছিনিয়ে নেবার নামান্তর। আর এ কারণেই তার মাঝে স্থায়িত্ব হবার যোগ্যতা ছিল না। যদিওবা তা সাময়িকভাবে যোগ্য ছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যেত। আরেকদিক থেকে ইংরেজ জাতি সমকালীন ফ্রান্সদের থেকে অধিক বাস্তববাদী বলতে হয়, কারণ তারা দ্রুত এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং তাদের করতলগত রাষ্ট্রগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান করে।

ভৌগোলিক স্বাধীনতা কিন্তু সাংস্কৃতিক গোলামী ঃ

ঐ সকল দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং স্বাধীনতার মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষ (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) উপকৃত হচ্ছে কিন্তু এখনো তারা সাংস্কৃতিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আপনাদের যাদের বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর পড়া-শোনা আছে তারা এ বিষয়ে এক মত পোষণ করবে যে, ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জনের পর বুদ্ধিগত গোলামী ও এলমী গোলামীর শৃঙ্খল আরো অধিক শক্তিশালী ও মজবুত হয়েছে।

এর কারণ কি ছিল? এ পর্যালোচনা অতি দীর্ঘ। অনেকে এ বিষয়ে স্ব-স্ব গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। এ বিষয়ে আমার মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ রয়েছে। উক্ত গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে আমার মতামত পেশ করতে সক্ষম হয়েছি। তবে এটা এক অতি বাস্তব বাস্তবতা যে, যে সকল দেশই ভৌগোলিক স্বাধীনতা লাভ করছে তারাই জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তা ও বুদ্ধিগত এবং সাংস্কৃতিক গোলামীর কঠিন জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এখন আপনারাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন ধরনের স্বাধীনতা উত্তম ছিল। ভৌগোলিক স্বাধীনতা নাকি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা অধিক

গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি ভৌগোলিক গোলামীকে তো কোন প্রকারেই সমর্থন করতে বা মেনে নিতে পারি না। বরং কোন ব্যক্তিই এ ধরনের চিন্তা করার দুঃসাহস রাখে না। এমন এক ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না যে, বিদেশী হস্তক্ষেপ, ভিনদেশী রাষ্ট্র-সরকারের পক্ষে ওকালতি করবে এবং তাদের কর্মতৎপরতাকে পূর্ণ সমর্থন করে তাদের সহযোগিতা করতে থাকবে। যদি কেউ এমন করে তাহলে তা জাতির জন্য শিশুসুলভ ও পরাধীন মানসিকতা বলে বিবেচনা করা হবে। যা আমি এক মুহূর্তের জন্য কল্পনাও করতে পারি না।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, প্রাচ্যের সকল দেশ বিশেষতঃ ভারতবর্ষ (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) এবং (আরব বন্ধুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলতে হয়) অনেকাংশে আরব দেশগুলো পাশ্চাত্যের গোলামীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে এবং তারা মূলত স্বাধীনতার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গেছে। ফলে তারা এখন পর্যন্ত বাস্তব স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে ব্যর্থ রয়েছে। এসব দেশ যেদিন থেকে, বরং সত্য কথা হল, যে সময় থেকেই তারা স্বাধীনতা লাভ করেছে সে সময় হতেই তারা পরাধীনতার এমন ভারি শৃঙ্খল ও বেড়ি পরিধান করেছে এবং শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-গবেষণা, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমনভাবে তারা পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণ করা শুরু করেছে যে, এ এছাড়া ভিন্ন কিছু বলা যাবে না যে, এদেশের বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এদেশের রাজত্ব পরিচালনা করছে এবং বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারগুলোতে এদেশের জনগণ ছাড়া ভিন্ন কোন লোক নেয়। এছাড়া কোন অর্থে বলা যাবে না যে, ঐ সকল দেশের জনগণ স্বাধীন।

আমরা ধর্মীয় গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রাশ্চাত্যের ভিখারী ঃ

বর্তমান অবস্থা হল আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ভিখারী, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকি। উন্নত জীবনব্যবস্থা আমরা প্রাশ্চাত্য থেকে আমদানী করে থাকি। এমন কি যে, আমরা ধর্মীয় গবেষণার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করে থাকি। বর্তমানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের ইউনির্ভাসিটির দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। প্রচ্যবিদদের যোগ্যতার লোহাকে শুধু পাশ্চাত্যে স্বীকৃত এমন নয় বরং প্রাচ্যের দেশগুলোতেই তা স্বীকৃত ও সমাদৃত। এক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের মতামতকে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ কথা বলে বিবেচনা করা হয়, এবং তাদের মতামতকে পর্যালোচনা করার অধিকার কারো নেই। এটা এমন এক বাস্তবতা যা থেকে কোন মুসলিম দেশই মুক্ত নয়। আর এ কারণেই বাস্তব স্বাধীনতা থেকে উপকৃত হবার সুযোগ এখনো ঐ সকল দেশ ও জাতির ভাগ্যে জুটেনি। এখনো তাদের

মন-মস্তিস্কে পাশ্চাত্যের কর্তৃত্ব বিরাজ করছে। তাদের দিল ও দেমাগে পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা এবং জীবন পদ্ধতিতে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব এত অধিক যে, তারা পাশ্চাত্যের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্যের অনেক দেশ এমন আছে যারা সৌভাগ্যক্রমে সকলেই মুসলমান। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত জীবনের কোন ক্ষেত্রে তাদের চূড়ান্ত আকীদা বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। তারা প্রতিনিয়ত মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন। এর পরিণতি দুর্বলতা, অস্থিরতা হীনমন্যতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফাসেদ নেতৃত্ব ঃ

ঐ সকল দেশের আরেকটি বড় সমস্যা ও সংকট হল এই যে, ঐ সকল দেশে যাদের হাতে নেতৃত্বের চাবিকাঠি এবং শাসনক্ষমতা রয়েছে তারা পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। তাদের নামগুলো মুসলমান, তাদের শিরা, উপশিরায় মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত। তারা ঐতিহ্যবাহী ও নামকরা মুসলিম পরিবারের সদস্য। তারা ইসলামকে অস্বীকার করে না। কিন্তু তাদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়া। আর দুর্ভাগ্যবশত হোক আর সৌভাগ্যবশত হোক তাদের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী সাদাসিদা মুসলমান। তারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। প্রিয় নবী (সাঃ) এর নবুওয়ত ও রেসালতের প্রতি বিশ্বাসী, তাদের বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর এমন এক জীবন রয়েছে, সেখানে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম, সেখানে ভাল-মন্দ সকল আমলের হিসাব দেওয়া লাগবে। তাদের বিশ্বাস এখানের আরাম-আয়েশ ক্ষণস্থায়ী, এখানের দুঃখ বেদনাও ক্ষণস্থায়ী। তাদের সামনে জাগতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছাড়া ভিন্ন এক মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা মনে করে, যে ভাল খানা-পিনা, উন্নত ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করা, মানব জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয় বরং মানব জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল, ভাল ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করা, আল্লাহর ভয় দিলে পয়দা করা, নেক কাজ করা, খারাপ কাজ বর্জন করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নির্ভেজাল জীবন যাপন করা। রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত শরীয়ত অনুপাতে জীবন যাপন করা, তাঁর আদর্শকে মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরা, বিশ্ব মানবতার খেদমত করা, সারা বিশ্বে ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। মানুষের সকল পেরেশানীতে সাহায্য-সহানুভূতি করা আর এগুলোই একজন প্রকৃত মুসলমানদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কিন্তু বর্তমান যাদের হাতে রাজ্যক্ষমতা ও শাসনভার রয়েছে তারা জীবন সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। ইসলামী অনেক মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে

তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে নড়বড়ে প্রমাণিত হয়। ইসলামের অনেক বিষয়ে তাদের সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। কারণ তাদের সামনে এ জগতের পর ভিন্নজগত, দৃশ্যবস্তুর পিছনে অদৃশ্যবস্তু রয়েছে, এ জীবনের পর অন্য জীবন এবং এ জীবনের আরাম-আয়েশ ও চিত্তরঞ্জন বস্তু ছাড়া ভিন্ন কোন বাস্তবতা রয়েছে, যদ্বারা মানুষ আনন্দিত ও প্রফুল্ল হতে পারে, এ ধরনের কোন বিষয় তার সামনে বিদ্যমান নেই। বর্তমানে আমাদের প্রাচ্যের দেশগুলোতে এ ধরনের অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও সংকট, বরং সঠিক কথা হল অপ্রয়োজনীয় অসংখ্য অস্থিরতা ও সংকট বিরাজমান। আর এ কারণে অসংখ্য শক্তি-সামর্থ্য ও সম্ভাবনা ঝরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গতকাল আমি আমার আরব বন্ধুদেরকে বলছিলাম যে, আমাদের প্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীগুলো যদি সঠিক নেতৃত্ব পেয়ে যেত, যোগ্য নেতা পেয়ে যেত, যারা তাদের সুপ্ত প্রতিভা সম্পর্কে অবগত, তাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালা যে সকল অসাধারণ গুণাগুণ দান করেছে— তাদের মাঝে জীবনের যে উদ্দীপনা, কুরবানী ও আত্মত্যাগের প্রেরণা, কোন বিষয় সঠিক বলে বিশ্বাস স্থাপন করার পর তার জন্য জান বাজির যে যোগ্যতা রয়েছে তা যদি আমাদের প্রাচ্যের দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হত এবং তাদের মেজাজ ও মানসিকতা কি ধরনের, তাদের অস্থি-মজ্জাতে কি জিনিস বদ্ধমূল, তারা কোন পরিবেশে তাদের জীবন পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে? তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য কি ধরনের? এসব বিষয় সম্পর্কে যদি এ সকল দেশের নেতৃবৃন্দের ধারণা থাকত তাহলে তারা বিশ্বের এমন এক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারত যার মোকাবেলা করা এবং যাকে চ্যালেঞ্জ করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ঈমানের শক্তি ঃ

এ সকল প্রাচ্যের দেশগুলোর শক্তির উৎস হল ঈমান। এ শক্তি এ কথার শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহকে সাথে নিয়ে বড় থেকে বড় এবং অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। আল্লাহর নামের মাঝে এখনো তাদের জন্য আকর্ষণ রয়েছে। আর এ জন্য এখনো তারা এ নামের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এখনো এ জন্য তারা নিজের পরিবার পরিজন, ঘর-সংসার উজাড় করতে সক্ষম। এখনো জিহাদের নাম ও ইসলামের খেদমতের শ্লোগান তাদের মাঝে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এটা তাদেরকে চুম্বুকের ন্যায় আকর্ষণ করে। আর তখন তাদের মাঝে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ফলে তখন তাদের মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে যায়।

মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ঃ

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হল, এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় হতে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে তারা সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত হচ্ছে কিন্তু তারা নিজেরা

নিজের জাতির যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে, বরং তারা নিজের সম্পর্কেই বেখবর রয়ে যাচ্ছে। আমার এ স্পষ্ট কথার জন্য আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লামা ইকবাল হয়ত এমন এক সময়ের জন্য বলেছিলেন—

اپنے من ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ؛ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

স্বীয় সত্তাকে খুঁজে পেয়ে যাও জীবনের সন্ধান।
আমার জন্য না হলেও নিজের জন্য হয়ে রও অম্লান ॥

এখান থেকে যারা শিক্ষা-দিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে যায় তারা বিশ্বের ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস, আধুনিক দর্শন এবং মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায় এবং এ সকল বিষয়ের সুখ্যাতি-সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে গবেষণা করে, কিন্তু তারা যদি কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকে তাহলে স্বীয় জাতির মন, মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। আর মূলতঃ যে সমাজে তাকে যেতে হবে, যে পরিবেশে তাকে কাজ করতে হবে, যে সকল মানুষের সাথে মিলে তাকে কাজ করতে হবে, যারা তার হাত-পা, যারা তার কাজের হাতিয়ার তাদের সম্পর্কে সে থাকে পূর্ণ বে-খবর। সে জানে না যে এদের মাঝে কেমন দক্ষতা, যোগ্যতা, শক্তি-সামর্থ্য লুকায়িত রয়েছে। তাদের মাঝে কোন ধরনের বৈদ্যুতিক ক্ষমতা রয়েছে যা দ্বারা তৎকালীন রাজা-বাদশাদের রাজসিংহাসন উল্টে দিতে এবং ক্ষমতার পট পাল্টাতে সক্ষম হয়েছিল এবং তৎকালীন যুগের সকল শক্তি মিলে তাদের মোকাবেলা করতে এবং তাদের চ্যালেঞ্জ করার মত দুঃসাহস কারো ছিল না।

দিলের ভাষা ঃ

এখনো আমাদের প্রাচ্যের দেশগুলোতে এমন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি বিদ্যমান রয়েছে যাকে আমরা ঈমানী শক্তি বলে থাকি। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দ হয়তো ঈমানী শক্তির ব্যাপারে বে-খবর নয়তো ঈমানী ভাষা বুঝতে অক্ষম। অর্থাৎ তারা মুসলিম উম্মাহর দিলের ভাষা বুঝতে অক্ষম। তারা তাদের দেমাগের ভাষা বুঝতে সক্ষম। তারা এমন ভাষা জানে যাদ্বারা মানুষের দেমাগকে শুনাতে সক্ষম কিন্তু তারা মানুষের দেমাগকে শ্রবণ করাতে সক্ষম কিনা এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু তারা দিলের ভাষার ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। তারা মানুষকে দিলের ভাষায় কথা বলতে অক্ষম, যা মানুষের দিলের গভীরে খুব সহজেই প্রবেশ করে এবং মানুষের অন্তরকে বিমোহিত ও বিগলিত করতে সক্ষম। যে ভাষা

মানুষকে কোন কাজের প্রতি উদ্দীপ্ত ও আসক্ত করতে সক্ষম, যে ভাষা মানুষের মস্তিষ্ককে হাতের মুঠোয় পুরে যুদ্ধের ময়দানে নিতে সক্ষম, এ ভাষা হল ঈমানের ভাষা, পবিত্র কুরআনের ভাষা, সাহাবাদের ভাষা, যদি কোন ব্যক্তি কারো ভাষা না বুঝে তাহলে সে অন্যের সাথে কথা বলবে কিভাবে? আমি যদি এখানকার বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ করতে চাই আর আমি যদি তাদের ভাষা না বুঝি এবং তারা যদি আমার কথা না বুঝে তাহলে এমন দৃশ্য সৃষ্টি হবে—

یار من ترکی باشد و من ترکی نمی دانم۔

'আমার বন্ধুর ভাষা তো তার্কিশ আর আমি তার্কিশ ভাষা বুঝতে সক্ষম নই।'

মুসলিম বিশ্বের নেতৃবর্গের অবস্থাও অনেকটা এমনই। তারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে এভাবেই কথা বলতে চায় যেভাবে ইউরোপীয়দের সাথে বলা হয়ে থাকে। অথচ তাদের বুঝা উচিত ছিল তারা যাদের সাথে আলোচনা করছে তারা প্রিয় নবী (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও মহাব্বতকারী। তাদের উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, তারা এমন এক জাতির সাথে কথা বলছে যাদের সব থেকে বেশি উদ্দীপ্ত ও উদ্‌জীবিতকারী এবং তাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ও অসুস্থ্যকে মৃত্যুশয্যা থেকে উঠাতে এবং দুর্বল অক্ষমকে উদ্দীপ্ত যুবকের মত তীব্রবেগে দৌড়াতে বাধ্য করে এ ঈমানী ভাষা। তাদের আরো জানা প্রয়োজন ছিল যে, আপনারা এ বাস্তবতার প্রতি ঈমান রাখেন এবং এ বাস্তবতাই হল আপনাদের কাছে প্রিয় এবং এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই আপনাদের কাছে অত্যধিক পছন্দনীয়। তারাও মুসলমান এবং আপনারাও মুসলমান। মসজিদে যেয়ে আপনারা তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, তাদের সাথে তাদের মহল্লাতে যেয়ে কথা বলতে পারেন, শুধু কথা বলা নয় বরং তাদের সাথে এমন ভাষায় কথা বলবেন যা তারা খুব ভালভাবে বুঝে এবং তারা সে ভাষা চৌদ্দ শত বছর ধরে বুঝে আসছে।

আমি আমার নিজের জন্য এ অবস্থান কোনক্রমেই গ্রহণ করতে রাজি নয় যে, আমি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধিতা করবো। আমি তো বলতে চাই যে, আপনারা এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় হতে সর্বাধিক জ্ঞান অর্জন করুন এবং আমিতো আপনাদের এবং আপনার পিতা-মাতা ও অভিভাবকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই এবং করে থাকি। বাস্তব বিষয় হল এই যে, আমাদের যুবশ্রেণীকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যধিক দক্ষতা অর্জন করা উচিত। তাদেরকে এসব ক্ষেত্রে অথরটি হওয়া এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করা উচিত। আর এটাই হল বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও প্রয়োজন।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণের মাঝে পার্থক্য ঃ

কিন্তু, আমার স্নেহভাজনগণ। আপনারা অবগত আছেন যে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণের মাঝে আসমান-জমিনের ফারাক রয়েছে। আমার এ ছড়ি অত্যন্ত উপকারী, এটাকে আমি ভর দেয়ার কাজে ব্যবহার করে থাকি, এ ছড়ি আমাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। এর মাধ্যমে আত্মরক্ষা হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ছড়িই একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। কারণ যদি আমি এ থেকে উত্তম কোন জিনিস পেয়ে থাকি অথবা এ ছড়ির যদি আমার আর কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমি নিজেই এটাকে বর্জন করব। এক সময়তো এটাকে আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যকারী অস্ত্র আবিষ্কারের পর মানুষ বর্জন করে বন্দুককে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সনাতনবাদ ও আধুনিকতা ঃ

এ জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আধুনিক ও সনাতনের মাঝে বিভাজন করা একেবারে ভুল। আমি কোন সময়ই এটার পক্ষপাতি নয় যে এলম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান... কখনো আধুনিক বা পুরাতন হয়ে থাকে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল এলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সব সময় সতেজ থাকে। ঐ এলম বা জ্ঞান-বিজ্ঞান যাকে আপনারা পুরাতন বলছেন তা তৎকালীন যুগে একেবারেই আধুনিক ছিল। আবার আজ যাকে আধুনিক বলা হচ্ছে তা পঞ্চাশ বছর পর হয়তো এমন পুরাতন হবে যে, এর নাম উল্লেখ করাও লজ্জার ও হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হবে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আধুনিকতা ও সনাতনতার নামে বিভাজন করা নিরর্থক ও অপবিত্র আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আপনারা ভাষার ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করুন, সায়েন্সের ক্ষেত্রে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করুন, এখানে যতগুলো বিভাগ আছে– যেমন কেমেস্ট্রি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্ট, ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সকল বিষয়ে পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জন করুন এবং অত্যন্ত আগ্রহ ও অধ্যবসার সাথে এ সকল ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করুন। কিন্তু এটাকে আপনি একটি উপায়-উপকরণ মনে করবেন। আপনি যে ময়দানে কাজ করবেন সেখানে আপনি এ উপায়-উপকরণের সহযোগিতা নিবেন।

দেহ প্রাচ্যের আর দিল-দেমাগ পাশ্চাত্যের ঃ

বর্তমানে প্রাচ্যের দেশগুলোতে যে সব অস্থিরতা বিরাজমান এবং যাকে আমি অহেতুক দ্বন্দ্ব বলে উল্লেখ করেছিলাম এবং এ অহেতুক দ্বন্দ্বে আমাদের বিরাট শক্তি ও প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ হল আমাদের দেশের নেতৃবর্গ

পাশ্চাত্যে অবস্থান করে। অর্থাৎ তারা প্রাচ্যে বসবাস করে কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও দিল-দেমাগের দিক থেকে তারা পাশ্চাত্যের প্রবাসী। যে জাতির সাথে তার নাড়ির সম্পর্ক, যাদের সাথে তার জীবন-মরণ, যাদের সাথে তার ভাগ্যের পরিবর্তন, সে জাতি হল খাঁটি ও পাক্কা মুসলমান। সুতরাং যদি তাদের থেকে কোন কাজ নিতে হয় তাহলে তাকে মুসলমান হিসেবেই নিতে হবে। আপনারা আফ্রিকার কোন মরুভূমির অধিবাসী নয় যে, সবেমাত্র চোখ খুলে দুনিয়া দেখা শুরু করেছেন। আফ্রিকার এমন অনেক দেশ রয়েছে যারা সবেমাত্র দুনিয়া দেখা শুরু করেছে। আমি তাদের অবমূল্যায়ন করি না। তারা সবেমাত্র দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ শুরু করেছে। এখনো দুনিয়াতে মানুষখেকো জাতি বসবাস করে। গতকালকেই এক ব্যক্তি আমাকে জানাল যে, ফিজিতে যখন প্রথম পাদ্রী পৌঁছে তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাকে কাবাব বানিয়ে বরকত স্বরূপ ভক্ষণ করেছিল। আর তার বুট জুতোকে সিদ্ধ করে সুপ বানিয়ে পান করেছিল। সুতরাং আপনারা এমন কোন জাতি নয় যাদের কোন ইতিহাস ঐতিহ্য নেই। যাদের কোন আকীদা বিশ্বাস নেই, যাদের কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি নেই। আপনারা এমন কোন জাতি নয় যে, যারা হঠাৎ করেই অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখেছে এবং এখানে আসতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। এ দেখে যে ইয়া আল্লাহ! এ উন্নতি অগ্রগতি, এ সকল আবিষ্কার, এ বৈদ্যুতিক লাইট, উড়োজাহাজ, এসব অটো পদ্ধতি, নিত্য নতুন গবেষণা, এ শহর এবং এখানের লোকজনের উন্নতি ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা কতইনা আশ্চর্যজনক ও রোমাঞ্চকর। আপনারা বিশ্বাস করুন যে, আপনারা কোন মরুভূমির বেদুঈন নয়।

আপনারা মুসলিম উম্মাহর সদস্য যারা দিয়েছিল বিশ্ব মানবতাকে মুক্তি ঃ

আপনারা এমন এক জাতির সদস্য যারা দীর্ঘকাল যাবত গোটা বিশ্বের নেতৃত্বপ্রদান করেছিল। যারা মানবতার ডুবন্ত জাহাজকে তীরে নিতে সক্ষম হয়েছিল। আমি গতকালই আরব বন্ধুদিগকে বলেছিলাম যে, যখন মানবতার জাহাজ ডুবেছিল এবং কাদায় আটকে গিয়েছিল এবং এ জাহাজকে কেউ উদ্ধার করতে প্রস্তুত ছিল না। তখন এ মুসলিম উম্মাহ এবং এ আরব জাতি যারা সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করে ধন্য হয়েছিল তারাই অগ্রসর হয়ে মানবতার জাহাজ উদ্ধার কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং মানবতাকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়। বিধায় আজ আমরা আমাদের জীবনের সফর ঐ জাহাজে করে পাড়ি দিচ্ছি।

আপনারা এমন এক জাতি যাদের সাথে ইউরোপীয়দের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং যারা পাশ্চাত্যের বাস্তবতার উপর চোখ বন্ধ করে আস্থা রাখে না।

আমাদের নেতৃবর্গের দুর্বলতা এবং আমাদের জাতির কাপুরুষতা হল এই যে, আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। এটাই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। অন্যথায় বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব প্রদান করা, সঠিক পথের রাহনুমায়ী করা, গোটা দুনিয়ার দেখভাল করার দায়িত্ব এ উম্মতের উপর ন্যস্ত ছিল। আর আজকেও আমি আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে, এখনো বিশ্বমানবতার দিকনির্দেশনা দেয়া ও রাহনুমায়ী করার যোগ্যতা একমাত্র এ উম্মতের রয়েছে। কারণ পশ্চিমা বিশ্বের রাহনুমায়ী ও নেতৃত্বের পরিণতি তো গোটা বিশ্ব পরিলক্ষ্য করছে। তারা যদিও মানবতার ফুলদানীকে নিত্য নতুন আবিষ্কার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে সক্ষম হয়েছে তারা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণতি করতে সক্ষম হয়েছে। একদা একজন ইউরোপীয় দার্শনিক দম্ভ ভরে একজন ভারতীয় দার্শনিককে বলেছিল আমরা এমন দ্রুতগামী জাহাজ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি যে, আটলান্টিক মহাসাগর কয়েক ঘন্টায় পাড়ি দিতে সক্ষম। এভাবে সে পশ্চিমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সফলতার গুণকীর্তন করছিল। আর ভারতীয় দার্শনিক তা অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে শুনছিল। অতঃপর যখন ইউরোপীয় দার্শনিকের কথা শেষ হল তখন ভারতীয় দার্শনিক বলতে লাগল— বাস্তব সত্য কথা যে, তোমরা আকাশে পাখির মত উড়তে শিখেছ, পানিতে মাছের মত সাঁতরাতে শিখেছ, কিন্তু আল্লাহর জমীনে এখনো মানুষের মত চলতে শেখনি। মূলত পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থাই হল এটা। নিঃসন্দেহে তারা উন্নতি ও অগ্রগতি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তাদের গন্তব্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অজানা রয়ে গেছে।

মৌলিক বাস্তবতা ঃ

আসল ও মৌলিক বাস্তবতা হল, এ বিষয়টি অনুধাবন করা যে, মানুষের পরিচয় কি? মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতি কি? এসব বিষয় জ্ঞাত হবার ক্ষেত্রে গোটা পশ্চিমা বিশ্ব একেবারেই সম্বলহীন রিক্তহস্ত। ফলে আজকের যাবতীয় জাগতিক বিপ্লব ছেলে খেলার মত রয়ে গেছে। বস্তুত পশ্চিমা সভ্যতা একটি নাটক মঞ্চস্থ করছে। যেমন শেক্সপিয়র এক একটি ড্রামা মঞ্চস্থ করেছে। আর আমরা সকলে কৌতুক দর্শকদের মত তা প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হচ্ছি। আর উল্লাস করে জয়ধ্বনি দিচ্ছি। হুররে হুয়া, কিয়া হুয়া। আমরা পাখির মত আকাশে উড়তে আর মাছের মত পানিতে ভাসতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এতে হল কি? মানুষ কতটুকু উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে?

আর মানবতার কতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে? এতে দুনিয়াতে কতটুকু শান্তি নিরাপত্তা ফিরে এসেছে? মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ববোধ কতটুকু সৃষ্টি হয়েছে? পরস্পরের সাথে কতটুকু কাছের ও আপন হতে পেরেছে? মানুষ মানুষকে কতটুকু জানতে বুঝতে সক্ষম হয়েছে? দিল কতটুকু আলোকিত হতে সক্ষম হয়েছে? আত্মিক প্রশান্তি কতটুকু লাভ হয়েছে? মানুষ নিজের মর্যাদা কতটুকু জানতে-বুঝতে সক্ষম হয়েছে? মানুষের নীতি-নৈতিকতার কতটুকু পরিশুদ্ধি হয়েছে? মানুষের মাঝে যে নীতিভ্রষ্টতা ছিল, অন্যের শিশুকে হত্যা করে নিজের শিশুর প্রাণ রক্ষা করা, অন্যের ঘর লুট করে নিজের গৃহ সজ্জিত করা, অন্যের পকেট মেরে নিজের পকেট গরম করা, অন্যকে অপমান করে, গোলাম বানিয়ে আনন্দিত হওয়া এবং বিজয়ের পতাকা উড়ান, এ ধরনের মন-মানসিকতা কি পরিবর্তন হল? যাঁরা এ দুনিয়াকে বাজার বা কশাইখানা মনে করেছিল এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় জুয়ার আসার বানিয়েছিল এবং যার পরিণতিতে দু'দু'টি বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হল, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই— এর পরিণতি কি হল? এ সকল আবিষ্কার ও বিপ্লবের দ্বারা মানুষের কি অর্জন হল? আমি একজন বাস্তববাদী ও সত্যপ্রিয় মানুষের মত জিজ্ঞাসা করতে চাই, এ বিশ্ব যুদ্ধের ফলে মানবতা তার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কতদূর অগ্রসর হল? দুনিয়া কতটুকু শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করল? আর মানুষ তার কতটুকু স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হল? বর্তমানেও আপনরা লক্ষ্য করছেন যে, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মাঝে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। দুনিয়াতে এখন পূর্ণ নির্লজ্জ বে-ইনসাফীর বাতাস বইছে। শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের বিষয়টি নিয়েই ভাবুন। উন্নত বিশ্ব সে দেশের স্থায়ী নাগরিকদেরকে দেশান্তর করে সে দেশে ভিনদেশী এমন এক জাতিগোষ্ঠীকে বসবাস করতে এবং নিজেদের মাতৃভূমি বানাতে পূর্ণ সহযোগিতা করছে যারা শতশত বছর নয় হাজার বছর ধরে সে দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে বিভিন্ন দেশে অপমানকর জীবন যাপন করছিল। এমন এক জাতিকে এনে আরবদের বুকের উপর বসিয়ে দিল। তাদের নিলর্জ্জ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও এবং ন্যায়-নিষ্ঠার দাবি উঠার পরেও দুনিয়ার আদালতে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব হয়নি। যে দেশ থেকে ফিলিস্তিনের মত ঘটনা ঘটতে পারে, যাদের পক্ষ থেকে এমন সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বে-ইনসাফী হতে পারে তাদেরকে এবং তাদের দেশকে কি উন্নত বিশ্ব বলা যেতে পারে? অতঃপর আজকের আমেরিকা, রাশিয়া এবং আপনাদের এ বৃটেন, কারো পক্ষে কি সম্ভব, এ বে-ইনসাফীর বিরুদ্ধে সভ্য মনে করে বলবে যে, আরবদের সাথে বে-ইনসাফী করা হচ্ছে এবং আমরা প্রকাশ্য জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছি।

আজ কি এই বৃটেনে হাতেগোনা এমন দু'চার জন্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে যারা বলতে সক্ষম যে, আমরা আরবদের সাথে যে অঙ্গিকারবদ্ধ ছিলাম তা আমরা বে-মালুম ভুলে গিয়েছিলাম এবং আমাদের থেকে বে-নজীর নীতিহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। এমন প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ বে-ইনসাফী দেশ ও জাতির সাথে বরং গোটা বিশ্ব মানবতার সাথে অহরহ ঘটে যাচ্ছে। আজ বিশ্ব মানবতার সাথে ভয়ংকর খেল খেলা হচ্ছে। অসংখ্য ধ্বংসাত্মক সংগঠন তৈরি করা হচ্ছে এবং এদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ চলছে। এসব সংগঠন গোটা বিশ্বকে এক ঘণ্টা নয় মাত্র কয়েক মিনিটে ধ্বংস করতে সক্ষম।

আপনারা অবগত আছেন যে, আমেরিকার কাছে এমন ধ্বংসাত্মক উপকরণ রয়েছে যা দ্বারা গোটা বিশ্বকে ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় বার ধ্বংস করতে সক্ষম। রাশিয়ার কাছে এ পরিমাণ না হলেও এ থেকে কম নয়। এখন চীনও প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছেও এর মজুদ রয়েছে। মোট কথা আগুন নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে। এতদিনতো শিশুরা ঘুড়িবাজি খেলত। ঐগুলোই ছিল তাদের উড়োজাহাজ এবং ঊর্ধ্ব বিজয়। কিন্তু এখন তারা আগুন ও আতশবাজি নিয়ে খেলা শুরু করেছে। কোন জালেম তাদের হাতে ছুরি ও রেজার তুলে দিয়েছে যাদ্বারা তারা একোপরের উপর আক্রমণ করছে। খোদা মালুম, কখন কে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

যদি আমরা ইউরোপ থেকে কিছু নিতে পারি তাহলে তাকে উত্তম কিছু দিতেও সক্ষম ঃ

আপনারা যে জাতির সাথে সম্পর্ক রাখেন তার একটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার জীবনের একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে। রয়েছে তার কিছু আকীদা-বিশ্বাস। তার সামনে রয়েছে একটি গন্তব্য ও ঠিকানা। এ জাতি কখনোই পাশ্চাত্যের সভ্যতা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। সুতরাং আপনারা অবশ্যই পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করবেন, তাদের ভাষাতে দক্ষতা অর্জন করবেন, এখানে বসে ইতিহাসের ব্যাপক গবেষণা করবেন, আমি এটাও বলবো যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি তাও অবগত হবেন, তা থেকেও আপনারা উপকৃত হবেন, কিন্তু কখনোই এটা মনে করবেন না যে, তারা এক্ষেত্রে প্রকৃত ইমাম ও পথিকৃৎ এবং সর্বশেষ উৎস বিশ্বমানবতারও বিশ্বজগৎ তাদের রহবরী ছাড়া চলতে সক্ষম নয়। প্রাচ্যের জাহেল ও অর্ধ-জঙ্গলী ও অনুন্নত জাতি-গোষ্ঠীর জন্য তারা হল রহমতের ফেরেশতা স্বরূপ। তারা আমাদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে আদর্শ মানুষ বানিয়েছে। যদি

আপনি এমন মনে করেন তাহলে আপনি নিজের উপর এবং নিজ জাতি-গোষ্ঠীর উপর এবং এ থেকেও বড় কথা হল যে উম্মতের সাথে আপনার সম্পর্ক তাদের উপর আপনি বড় জুলুম করেছেন। আর নিজের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে এ থেকে বড় বে-ইনসাফী হতে পারে না। আপনি অবশ্যই এখান থেকে ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করবেন যা আপনি স্বদেশে পেতে সক্ষম নয়। কিন্তু এখানে থেকে আপনাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে তারা অসংখ্য বিষয়ে খুকলা, নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত। আমরা তাদের থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারি আর তারাও আমাদের থেকে অসংখ্য কিছু শিখতে পারে। যদিও এ সিদ্ধান্ত নেওয়া এখন সম্ভব নয়। হয়তো এ বিষয়টি আপনারা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে নাও পারেন এবং এ বিষয়ে আমার সাথে একমত পোষণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ আপনাদের মনে হতে পারে যা তারা প্রাচ্যের মুসলমানদের কাছ থেকে শিখবে তা অধিক মূল্যবান নাকি যা আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিখছি ও গ্রহণ করছি তা অধিক মূল্যবান। যে বিদ্যা আমরা শিখতে এখানে এসেছি, তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নাকি তারা যা আমাদের কাছে শিখতে আসবে তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। এখন আমি এ বিষয়ে কোন আলোচনা করতে রাজি নয়। তবে আপনারা এটা মেনে নিন যে, যা আমরা তাদের শিখাতে পারি তা অধিক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। আর আমরা যা তাদের কছে শিখতে এসেছি তা খুবই নগণ্য ও তুচ্ছ। তবে আমি এখন অবশ্যই এতটুকু আরজ করবো যে, দুটি বিষয়ে আমরা তাদের কাছ থেকে শিখতে পারি এবং দুটি বিষয় আমরাও তাদের শিখাতে পারি। আর এ কথা বলছি আমি অনেক নিচে নেমে এসে। অন্যথায় বাস্তব কথা হল যদি আমরা তাদের থেকে দুটি বিষয়ে শিখি তাহলে আমরা তাদেরকে দশটি বিষয়ে শিখাতে পারি। কারণ আপনারা তাদেরকে শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা তাদের জীবন এখানেও সফলতা লাভ করবে এবং আখেরাতেও সফলতা লাভ করবে। এটা আমাদের যেমন আকীদাহ বিশ্বাস তেমন খৃষ্টানদের আকীদাহ বিশ্বাস। আর আমরা যা শিক্ষা গ্রহণ করছি তা না হলে হয়তো আমাদের যাত্রা পথে বিলম্ব হবে। জীবন চলার পথে কিছু কষ্ট হবে। গন্তব্যে পৌঁছতে একটু সময় বেশি ব্যয় হবে। এ থেকে বেশি কিছু নয়। এটাই হল তাদের ধর্মের সারাংশ এবং আমাদের ধর্মেরও সারসংক্ষেপ। এখন আপনারাই ইনসাফ করে বলুন যে, তাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ না আমাদের ধর্ম?

দুনিয়ার সফলতা ও বরবাদী মানুষের সাথে সম্পৃক্ত

এ আলোচনাটি লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক তাবলীগি এজতেমাতে করেছিল। এ এজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২১/১২/১৯৬৯ ইং সনে। এবং পরবর্তীতে নেদায়ে মিল্লত পত্রিকাতে প্রকাশ পেয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী বরবাদী ঃ

বর্তমানে গোটা দুনিয়াতে মত বিরোধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। নিত্যদিনের যে সকল বিষয় সূর্যের ন্যায় আলোক দ্বীপ্ত এবং এগুলোতে মতবিরোধ করার মত কোন সুযোগ নেই, সেখানেও মতবিরোধ চলছে। এমন কোন দাবী নেই যাকে সকলেই এবং সর্বত্রই ও সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ হতে তার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে। এমন কোন বিষয় নেই যে ক্ষেত্রে সকলেই একমত পোষণ করে। কিন্তু একটি বিষয় এমন রয়েছে যাকে সকলেই সমর্থন করবে এবং আপনি যেখানেই যাবেন এর আওয়াজ সকলের কাছ থেকে শুনতে পাবেন। আর এ বিষয়টি হল এই যে, বর্তমানে সর্বত্র ফাসাদ আর ফাসাদ, বিগাড় আর বিগাড়। এ থেকে দুনিয়ার কোন এলাকা কোন অঞ্চল, কোন অলি-গলি মুক্ত নয়। এমন কি যে সকল দেশ জাগতিক উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেছে সেখানেও যদি আপনি যান তাহলে সেখানেও আপনি এ নিয়েই বিলাপ করতে দেখবেন। কোন সভা-সমিতি, মিটিং-সিটিং, কোন বই-পুস্তক ও আলোচনাসভা, কোন চিন্তা-ভাবনার বৈঠক এ থেকে খালি নয়। দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আপনি সফর করুন সর্বত্রই এই অভিযোগই আপনি শ্রবণ করবেন যে, গোটা দুনিয়াতে ফাসাদ আর ফাসাদ, বিগাড় আর বিগাড়, দুনিয়া আজ সর্বগ্রাসী ফাসাদের শিকার। এটা এমন এক বাস্তবতা যার সাথে দুনিয়ার প্রায় সকল বুদ্ধিমান ও যারা এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এমন কি যারা এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতা রাখে না সকলেই একমত পোষণ করে। যাদের বই-পুস্তক দেখার সুযোগ হয় না তাদের কানেও একথা পৌছে গেছে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশ হোক কিংবা ভিন দেশ, ইউরোপ থেকে আমেরিকা, আফ্রিকা থেকে এশিয়া, এমন কি বরকতময় ও পুণ্যভূমি মক্কা-মদিনাতেও যদি আপনি যান তাহলে এ সাধারণ অনুভূতি আপনার পরিলক্ষিত হবে।

এটা এক পেরেশানকারী ও অমীমাংসিত বাস্তবতা যার আগামাথা কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি যে, বিশ্বে বিগাড় ও ফ্যাসাদ শুরু হয়েছে কিন্তু এর

কারণ কি? এ বিষয়টি যতই পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ততই যেন বিগড়ে যাচ্ছে। কারণ এর প্রতিকারের যে খোদায়ী যোগ্যতা ছিল তা মানুষ হারিয়ে ফেলেছে এবং এ সম্পর্কে বে-খবর রয়ে গেছে।

দুনিয়ার সফলতা ও বরবাদী মানুষের সাথে সম্পৃক্ত

এটা সর্বজন স্বীকৃত বাস্তবতা যে, আমরা মুসলমানদের আক্বীদাহ-বিশ্বাস অনুযায়ী এবং যারাই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী এবং যাদের মাঝেই আল্লাহর গুণাবলির কিঞ্চিত বিশ্বাস রয়েছে তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, এ দুনিয়ার উন্নতি এবং এ দুনিয়ার ফ্যাসাদ, এ দুনিয়ার সফলতা ও এ দুনিয়ার ব্যর্থতা, এর প্রস্ফুটিত হওয়া এবং তা নিষ্প্রভ হওয়া, এর প্রাচুর্যতা ও বরবাদী সব কিছুই মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ যদি ভাল হয় তাহলে সব কিছুই ভাল। আর মানুষ যদি বিগড়ে যায়, সঠিক রাস্তা ত্যাগ করে, আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়, ধ্বংস ও বরবাদীর পথে চলতে সংকল্পবদ্ধ হয়, সে যদি তার নিজের মূল্য ও মূল্যায়ন সম্পর্কে অবগত না থাকে, সে যদি তার স্রষ্টা ও রবকে ভুলে যায় এবং এর পরিণতিতে সে আত্মভোলা হয়ে পড়ে, তার যদি সত্তার আদি-অন্ত ও পরিণতি সম্পর্কে খবর না থাকে বা ফিকির না থাকে তাহলে এ জগতে কেউ ধ্বংস ও বরবাদীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং ফ্যাসাদগ্রস্ত এ দুনিয়াকে কেউ পুষ্পভরা বসুন্ধরাতে রূপান্তরিত করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা গণী ও অমুখাপেক্ষী। তিনি কোন কাজের জন্য কোন মানুষের প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু তিনি একটি নিয়ম নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর এটাই হল সুন্নাতে ইলাহী, আল্লাহ তায়ালার অভ্যাস। আর এ সুন্নাতে ইলাহী পরিবর্তন হবার নয়। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে —

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا ـ

'তোমরা আল্লাহর সুন্নাতকে কখনো পরিবর্তন হতে দেখবে না।' পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যার জন্য যে নিয়ম নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে জিনিসের মাঝে যে গুণাগুন লুকায়িত রেখেছেন হাজার বছর পরেও তার মাঝে সে গুণাগুণ পরিলক্ষিত হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ পাকের এ নিয়ম চালু রয়েছে। যেমন হাজার বছর পূর্বেও ছিল।

আল্লাহ তায়ালা তার বিজ্ঞপ্রজ্ঞার এবং তাঁর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দুনিয়ার ভাল-মন্দ সফলতা ও বরবাদী মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের এটাই হল নিয়ম যে, এ দুনিয়ার অস্তিত্ব মানুষের

অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। যদি মানুষ ভাল হয় তাহলে দুনিয়ার অবস্থা ভাল হবে। আর যদি মানুষ খারাপ হয় তাহলে দুনিয়া জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে। যদি আপনি ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনাবলি সন্ধান করতে চান এবং ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়গুলো তালাশ করেন, তাহলে আপনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, দুনিয়ার বিগাড় ও বিপর্যয় মানুষের কারণেই সংঘটিত হয়েছে। মূলত মানুষই হল দুনিয়ার উন্নতি, অগ্রগতি ও সৌভাগ্য-সফলতার মূল উৎস। আবার মানুষই হল দুনিয়ার সকল ফ্যাসাদ ও বরবাদী, ধ্বংস ও বিগাড়ের মূল উৎস। তাই দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা, সৌভাগ্য ও সফলতার জন্য যে মৌলিক বস্তুর উপর মেহনত ও দৃষ্টি প্রদান করা উচিত। তা হল একমাত্র মানুষ ও মানুষের সত্তা। আল্লাহ্ তায়ালা নবীগণের যে সঠিক তরবিয়ত করেছিলেন এবং তাদেরকে যে সুস্থ বিবেক ও জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছিলেন এবং তাদেরকে যে নবুওয়তের নূর প্রদান করেছিলেন সে নূরের আলোতে তারা এ বাস্তবতার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এ দুনিয়াতে যা কিছু তাদের করণীয় রয়েছে তা হল মানুষের পরিশুদ্ধি এবং মানুষের হেদায়েত। এ জন্য সঠিক পথ ও পন্থা অনুধাবন করা এবং এ জন্য নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে ব্যয় করা।

নবীগণ (আঃ) সকল শক্তি ব্যয় করেছেন মানুষের পরিশুদ্ধির জন্য ঃ

নবীগণ প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে ছিল, আল্লাহর কুদরত তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এদিকে আল্লাহর ফয়সালা ছিল যে, নবীদের (আঃ) মাধ্যমে পথভোলা মানুষ ও মানবতাকে ধ্বংস ও জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডতে পরিণত এ বসুন্ধরাকে আবার শান্তি ও নিরাপত্তা এবং প্রফুল্লতা প্রদান করাবেন। তারা যেন ধুলোর ধরায় বসেই জান্নাতের তৃপ্তি ও স্বাদ আস্বাদন করবে, তারা যেন এ জীবনেই জান্নাতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এ দুনিয়াতেই যেন তারা মানুষের মত বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন করে। আর এ জন্য যখনই তাদের কাছে ওহির সামান্য অংশই এসেছে তারা কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই এবং এক মুহূর্ত কালক্ষেপণ করা ছাড়াই এবং একদিনের অভিজ্ঞতা অর্জন করার প্রয়োজন উপলব্ধি করা ছাড়াই তাদের সকল শক্তি একটি বিষয়ে ব্যয় করেছে। আর তা হল মানুষের পরিশুদ্ধি।

স্বয়ং মানুষ একটি জগৎ ঃ

বাস্তব কথা হল মানুষ স্বয়ং একটি জগৎ। মানুষ তার ব্যাপকতার ক্ষেত্রে, গভীরতার ক্ষেত্রে, সমস্যা ও সংকটের ক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ ও আকৃতির ক্ষেত্রে, তার

সুপ্ত প্রতিভার দিক থেকে, তার গভীরে লুকায়িত স্তর স্তর পর্দার দিকে থেকে কোন অংশে এ বিশ্ব জগৎ থেকে, সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহ থেকে এবং আমাদের এ বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবী থেকে কম নয়। মানুষ এক বিশাল-বিস্তৃত মাখলুক। তার অতল গভীরের পৃষ্ঠদেশের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। যেমন সমুদ্রের গভীরে একটি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপণ করে জানা সম্ভব নয় যে, তা কোথায় গেল ঠিক তদ্রুপ তার গভীরতা আরো অধিক, তার তলদেশ সম্পর্কে তার স্রষ্টা ছাড়া আর কারো খবর নেই।

اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

অর্থ ঃ অবশ্যই তিনি জানেন যাকে তিনিজ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি হলেন অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী ও প্রতিটি জিনিসের খবর রাখেন।

স্বয়ং মানুষ এক বিশাল-বিস্তৃত জগৎ। আল্লাহ তায়ালা তাকে দিল ও দেমাগ প্রদান করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছে। তাকে আল্লাহ তায়ালা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দান করেছেন, যা অনেক বিশাল-বিস্তৃত ও সুউচ্চ। তাকে দান করা হয়েছে অসংখ্য খাহেশাত, স্বপ্ন, আশা ও প্রত্যাশা। তার রয়েছে অগণিত জরুরত, চাহিদা, ইচ্ছা ও পরিকল্পনা। মোটকথা মানুষ বিশাল-বিস্তৃত এক জঙ্গল। যা নিয়ে গবেষনা করলে বড় বড় গবেষক নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে।

নবীগণের (আঃ) সামনে যখন মানুষ উপস্থিত হল এবং তারা যখন উপলব্ধি করল যে, তাদের পুরা মেহনত এ মানুষের উপর করতে হবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধি করতে হবে তখন তাদের সামনে এক বড় পরীক্ষা এক বড় চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত হল। সে সময় যদি কোন দক্ষ মনোবিজ্ঞানী হত বা কোন বড় ধরনের সংস্কারক কোন দক্ষ শিক্ষক, কোন চিন্তাবিদ বা দার্শনিক হত তাহলে অবশ্যই তাদের অজস্র পদস্খলন ঘটত। কারণ তারা মানুষের মনুষত্বের সন্ধান করতে চেষ্টা করত। আর এভাবেই তাদের জীবন শেষ হয়ে যেত। বরং কয়েক প্রজন্ম শেষ হয়ে যেত। তদুপরি তার সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হত না। তার মানুষ হওয়াটাই এমন একটা দিক যার সত্ত্বাগত বিষয় উপলব্ধি করাটাই হল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মানুষ নিজেই নিজের প্রকৃত সত্ত্বা সম্পর্কে বেখবর। তার রয়েছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। কিছু শাখা-প্রশাখা তো মানুষের জন্য জানা সম্ভব রয়েছে। আর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়ে গেছে অজানা। সুতরাং নবীগণের (আঃ) সাথে যদি আল্লাহর রহমত না হত, আল্লাহর রাহনুমায়ী ও পৃষ্ঠপোষকতা ও

আল্লাহর গায়েবী সাহায্য-সহযোগিতা না হত এবং যদি আল্লাহর ফয়সালা না হত যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের হিদায়াতের কাজ নেওয়া হবে এবং এ ধরণীর ফ্যাসাদ ও বিগাড় তাঁর দ্বারা দূর করা হবে এবং মানুষকে তাঁর মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে, মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হবে তাহলে মানুষের হেদায়াতের কাজ সহজ ছিল না ।

মানুষই ইসলাহ ও পরিবর্তনের কেন্দ্র ঃ

মানবতার গবেষক প্রজন্ম একের পর এক জীবন শেষ করেছে এবং তারা মানুষের দেমাগকে তাদের কর্মক্ষেত্র বানিয়েছিল। কিন্তু তারা দেমাগ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা নবীগণের (আঃ) উপর দয়া করেছেন এবং তাদের রাহনুমায়ী করেছেন যে, দুনিয়ার ইসলাহ ও সংস্কারের মূলকেন্দ্র হল মানুষ। আর মানুষের ইসলাহ ও পরিবর্তনের কেন্দ্র হল দিল। দিল বলতে যদিও একটি শব্দ উচ্চারিত হয়। কিন্তু তার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি কেউ আন্দাজ করতে সক্ষম নয়। গোটা বিশ্ব তার একটি গ্রাসে পরিণত হতে পারে। এ বিশ্ব জগতে তার বিস্তৃতির মাঝে এমনভাবে হারিয়ে যেতে সক্ষম যে এর সন্ধান লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়াত ও রাহনুমায়ী করেছেন। ফলে মানুষের মাঝে ভাল ও কল্যাণকর হবার ইচ্ছা প্রদান করেছেন। মানুষকে নিজের সত্তা জানার, স্বার্থ পরিত্যাগ করার বাসনা তার মাঝে সৃষ্টি করেছেন। অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, অন্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করা, নিজের এবং অন্যের জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির রাস্তায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা, যেন সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক চলতে পারে।

সকলেই যেন নিজের শাহওয়াত ও খাহেশাত, মনচাহি জিন্দেগী ও প্রবৃত্তির বন্দেগী হতে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হয়। তাদের উপর যেন পেটের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হয়, যেন খাহেশাতের রাজত্ব না হয়। তাদের উপর যেন কোন হীন ও তুচ্ছ বস্তুর কর্তৃত্ব না চলে। তারা শুধু নিজের ও নিজের অধিনস্তদের পেট ভরার ফিকিরে না থাকে। তারা যেন দুনিয়ার পরিধি নিজের ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে। দুনিয়াকে যেন নিজের চার সন্তান বা আট সন্তান বা নিজের বারোজন সদস্যের পৃথিবী মনে না করে। এটা যেন মনে না করে যে, গোটা দুনিয়া তার ঘরে এসে গেছে এবং তার ঘর-সংসারই তার দুনিয়া। এর মাঝেই আমার জীবন-মরণ।

মানুষ যেন এ খাঁচা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং বিশাল বিস্তৃত দিগন্তকে চিনতে সক্ষম হয়। কারণ পিঞ্জিরা তো পিঞ্জিরাই। যদিওবা তা স্বর্ণ ও লৌহ দিয়ে নির্মিত হয়।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "এভাবে আমি আসমান জমিনের ভাণ্ডার দেখালাম যাতে সে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হয়।" তার জানা হয়ে যায় যে, তার স্রষ্টা কে, তাঁর গুণাবলী ও সিফাত কি? তাঁর কাছে কি আছে এবং তাঁর কাছে কোন ধরনের জিনিসের প্রত্যাশা করা যেতে পারে? তাঁর ধন-ভাণ্ডারে কিছু আছে কি? এবং তা থেকে আমি কিছু পেতে পারি কি? এমন কোন আমল ও আখলাক, এমন কোন আক্বীদা বিশ্বাস রয়েছে, এমন কোন জীবন ব্যবস্থা রয়েছে যদ্বারা আমি আমার স্রষ্টা হতে ঐ সকল নিয়ামত লাভে ধন্য হতে পারি যা কেউ কল্পনা করতে সক্ষম নয়।

نَ مالاعين رأت ولااذن سمعت وما خطر على قلب بشر ـ

অর্থ ঃ যা কোন চক্ষু আজো অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ আজো শ্রবণ করেনি এবং কোন দিল আজো কল্পনা করতেও সক্ষম হয়নি।

মানুষের মাঝে অজস্র হিংস্রতা রয়েছে যদি তা প্রকাশ পায় তাহলে দুনিয়া বরবাদ হয়ে যাবে ঃ

মানুষ একটি জঙ্গল। এ জঙ্গলে প্রায় সব ধরনের ভাল্লুক, চিতা, সিংহ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী রয়েছে। এ মনে করবেন না যে, এগুলো মানুষের বাইরের জগতে বসবাস করে। বরং সত্য কথা হল, তা মানুষের ভিতরে অদৃশ্যমান এবং বাইরে তার প্রকাশ ঘটে। মানুষের ভিতরের বাঘ ও সিংহ, মানুষের ভিতরের চিতা এবং হিংস্র প্রাণী, মানুষের ভিতরের কুকুর ও শূকর বাইরের কুকুরের শব্দ থেকে অনেক বিষাক্ত, অনেক বেশি হিংস্র ও মানুষের রক্ত প্রিয় ও পিয়াসী। মানুষের ভিতরের হিংস্র প্রাণী বাইরের প্রাণী থেকে অনেক বেশি খবিছ ও বর্বর। এগুলো মানুষের ভিতরের সাপ-বিচ্ছু। যখন থেকেই এগুলো বাইরে বের হওয়া শুরু করেছে তখন থেকেই দুনিয়া ধ্বংস ও বর্বাদ হচ্ছে।

বাহ্যিক হিংস্র প্রাণী কখনো দুনিয়াকে আক্রমণ করেনি ঃ

বাহ্যিক সাপ ও বিচ্ছু কখনো দুনিয়াকে সংকীর্ণ করেনি, আপনি ইতিহাসের পাতায় দেখবেন না যে, সাপ বিচ্ছু সংঘবদ্ধ হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে স্বসস্ত্র আক্রমণ করেছে। আপনি কখনো শুনতে পাবেন না যে, সারা দুনিয়ার বাঘ-সিংহ একত্রিত হয়ে দুনিয়াতে সংঘবদ্ধ হামলা চালিয়েছে। এ সমাবেশে অসংখ্য ইতিহাসের ছাত্র রয়েছে। আপনারা কি কোন ইতিহাস গ্রন্থে পড়েছেন যে, বাঘ কখনো মানুষের সাথে যুদ্ধ করেছে? মানুষের সাথে যুদ্ধের কথা না হয় বাদ দিলেন। কিন্তু বাঘ কখনো কি বাঘের সাথে যুদ্ধ করেছে? কিন্তু আপনারা কত অসংখ্যবার পড়েছেন এবং পড়তে পড়তে আপনাদের ধৈর্যচ্যুত ঘটেছে। পড়ার কথা বাদ দিলেও আমরা অনেকেই দু'টি বিশ্ব যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছি। যদিওবা আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শিশু কিশোর ছিলাম। এ দুটি বিশ্বযুদ্ধে কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে? আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, এটা কি মানুষের বিরুদ্ধে সাপ, বিচ্ছুর লড়াই ছিল? নাকি সাপ ও বিচ্ছুর লড়াই ছিল সাপ ও বিচ্ছুর বিরুদ্ধে। হয়ত সাপ কখনো বিচ্ছুর বিরুদ্ধে লড়াই করে, বিচ্ছু কখনো বিচ্ছুর বিরুদ্ধে লড়াই করে, সাপ কখনো সাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে, বাঘ কখনো বাঘের উপর আক্রমণ করে। কিন্তু এরা কখনোই সংঘবদ্ধ হয়নি। বাঘ সিংহ বা কোন হিংস্র প্রাণী সংঘবদ্ধ হয়ে বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেনি।

এক দেশের হিংস্র প্রাণী কখনো অন্য দেশের হিংস্র প্রাণীর উপর আক্রমণ করেনি ঃ

হিংস্র প্রাণীর মাঝে কখনো কোন জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়নি। আর এ লক্ষ্যে এক দেশের হিংস্র প্রাণী অন্য দেশের হিংস্র প্রাণীর বিরদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু আপনারা কি বলতে পারবেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের সাথে মানুষের যুদ্ধ কোন একদিনের জন্য বিরত রয়েছে কি? এক দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধ কি থেমে রয়েছে? বরং বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে এক শহরের মানুষের সাথে অন্য শহরের মানুষের সংঘাত রয়েছে। এক মহল্লা অন্য মহল্লার সাথে যুদ্ধরত। ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবং আপন জনের বিরুদ্ধে আপনজন যুদ্ধরত। কিন্তু হিংস্র প্রাণীর সম্পর্কে এমনটি শোনা যায় না।

মানুষের ভিতরে হিংস্রতা কখন বাইরে আসে?

আল্লাহর রাসূলগণ এ হিংস্রতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, বাদশা সিকান্দরের মত যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করে রেখেছে, মানুষের এই

সকল হিংস্রতা ইয়াজুজ-মাজুজের মত তার মাঝে বন্দি হয়ে রয়েছে। মানুষে হিংস্রতার মুখে লাগাম দেওয়ার জন্য, মানুষের খায়েশাতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন এবং তাকে কাবুতে রাখার জন্য বরং এ পশুত্বকে মানুষের রূপে পরিবর্তন করা জন্য নবীগণের নিকট একটি চিকিৎসা রয়েছে। যদি মানুষ অহংকারবশতঃ ত প্রত্যাখান করে এবং এ নিয়ামতের অবমূল্যায়ন করে তাহলে মানুষের মাঝে যে হিংস্রতা ও পশুত্ব রয়েছে তা বাইরে বের হয়ে আসে এবং দুনিয়াতে প্রলয়ংকর তাণ্ডবলীলা চালায়। আর দুনিয়া এক ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়।

যখন মানুষ মানুষকে নিয়ে শিকারের নেশায় মত্ত হয় এবং এক মানুষ অন মানুষের রক্ত পিয়াসি ও রক্তের হলি খেলে তখন যা ঘটে তা আপনাদের সামনেই রয়েছে।

আল্লাহর তালার পক্ষ থেকে নবীদের জন্য দ্বিতীয় তৌফিক ছিল এই যে তিনি তাদেরকে এ বুঝ দান করেছিলেন যে, মানুষের দিলের ওপর তাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করা উচিত। হাদীস শরীফে আছে–

الا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلى الجد الجسا كله واذا

فسرت فسد الجسوالجد كله الا وهى القلب۔

অর্থ ঃ মানুষের মাঝে গোশতের একটি টুকরা আছে। একটু সামান্য টুকরো, মানুষের গোশতের, যদি তা ঠিক হয়ে যায় সুস্থ থাকে, তাহলে গোটা দেহ ঠিক থাকে এবং সুস্থ থাকে। যদি তা বিগড়ে যায় তাহলে গোটা দেহ বিগড়ে যায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর শুন! তা হলো দিল। এ জন্য নবীগণ তাদের সকল শক্তি সামর্থ্য, উপায় উপকরণ বুদ্ধি-বিদ্যা দুনিয়ার সকল সম্পদ মানুষের দিলের পিছনে ব্যয় করেছে। কারণ, তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, দুনিয়ার সকল উপায়-উপকরণ, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, এক একটি পয়সা, দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার যত নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন যত উপকারী বস্তু এবং ক্ষতিকর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এ সব কিছুই মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষের মাঝে যদি কল্যাণের ইচ্ছা তৈরি হয় তাহলে যদি তার কাছে কোন উপায়-উপকরণ নাও থাকে তবুও সে মানুষের কল্যাণের জন্য উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে নিতে সক্ষম এবং আল্লাহ তায়ালাও মানুষের এ কল্যাণকর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য উপায়-উপকরণ সহজে প্রস্তুত করে দেন। যদি মানুষের মানসিক অবস্থা সঠিক হয়ে যায়, যদি মানুষ কল্যাণের প্রত্যাশী হয়, যদি মানুষ মানুষের কল্যাণকামী হয়, যদি মানুষ মানুষের উপকার করার সংকল্প করে, যদি মানুষের মাঝে মানব

সেবার আকঙ্খা সৃষ্টি হয়, যদি মানুষ নিজের খায়েশাত থেকে পবিত্র হয়, যদি মানুষ নিজের অস্তিত্বকে অন্যের জন্য বিলীন করতে সক্ষম হয়। যদি অন্যের জীবনের তরে নিজের আত্মোৎসর্গ করতে সক্ষম হয়, যদি মানুষ দুনিয়া থেকে বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে চায়, যদি এ ধরণীর বুক থেকে হিংসা ও প্রতিহিংসার আগুন নিভাতে সক্ষম হয়, যদি মানুষ দুনিয়াতে নিরাপত্তা, সচ্ছলতা, আল্লাহর ভালবাসা, মানুষের মূল্যায়ন, মানবজীবনের মূল্য ও মূল্যায়নের অনুভূতি দ্বারা গোটা মানবতার আঁচলকে ভরে দিতে চায় তাহলে এ মহৎ উদ্দেশ্যর জন্য যদি কোন উপায়-উপকরণ নাও থাকে, তদুপরি সে এমন এক বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম, যা উপায়-উপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ কোন ব্যক্তি করতে সক্ষম হয়নি এবং অনন্তকাল পর্যন্ত এমন বিপ্লব সাধিত হতে পারে না। মূলত আসল বিষয় হয় মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্প। যদি মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্প সঠিক হয়ে যায় এবং ইচ্ছা ও সংকল্প যে উৎস থেকে সৃষ্টি হয় সে উৎসও যদি সুস্থ ও সঠিক হয়ে যায় তাহলে সবকিছুই সঠিক হয়ে যাবে।

সকল খারাবির উৎস মানুষের দিল ঃ

আমাদেরই হাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক বড় শক্তি রেখেছেন। অথচ এ হাত কোন বিষয় নয়। এর বিশেষ কোন সত্তা নাই। এ হাতের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু এ হাত কখনো মজলুমের উপর জুলুম করতে উদ্যত হয়, আবার জালেমের সহযোগী হিসেবে কাজ করে বরং সব সময় জালেমের সাথেই থাকে। আর বর্তমান অবস্থা হলতো, সব সময় এ হাত জুলুমের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। আজকে গোটা বিশ্বের সকল মানবশক্তি এবং গোটা বিশ্বের সকল শক্তি জুলুমের জন্য ওয়াকফ ও উৎসর্গ করা হয়েছে। এটা কোন নতুন ও কল্পনাতীত কথা নয়। যদি মানুষের দিল বদলে যায়, যদি মানুষের দিলে ও তার নিয়তে খারাবির নেশা আসে এবং মানুষের দিলে মানব দুশমনি বাসা বাধে, যদি এ দিল মানুষের রক্তের নেশায় মত্ত হয়ে যায় তখন তার হাত অনাথ এতিমের শিরশ্ছেদ করে, বিধবাদের সম্ভ্রমের শেষ উড়না ছিনিয়ে নিতে, তার ঘোমটা কেড়ে নিতে, তার লজ্জা সম্ভ্রম হিফাজতের শেষ ঠিকানা ছিনিয়ে নিতে, গরিব-দারিদ্র্যের ভুকাগ্রস্ত ঘর থেকে যারা কয়েক সপ্তাহ পর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল এবং নিজের ও এতিম বাচ্চাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল- এমন হতদরিদ্রের অন্ন কেড়ে নিতে এবং তাদের চুলার আগুন পানি করে দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

বস্তুত আসল সমস্যা হাতের নয়, বরং এ সমস্যা এবং এ ধরনের সকল সমস্যার মূল উৎস হলো মানুষের দিল, মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্প। মানুষের অন্তরে

কি কল্যাণের তলব পয়দা হয়েছে, মানুষের অন্তরে কি খোদাভীতি সৃষ্টি হয়েছে? মানুষের সামনে কি এ বাস্তবতা ফুটে উঠেছে? মানুষ কি নিজের সৃষ্টির রহস্য, প্রারম্ভ ও পরিণতি বুঝতে সক্ষম হয়েছে?

সকল পরিণতির উৎস মানুষের দিল ঃ

মানুষের দিলে আল্লাহ তায়ালা যত উর্বরতা রেখেছেন তার মাঝে স্বর্ণ উৎপাদন করার যে যোগ্যতা দান করেছেন, এ দিলের সামনে সাইবেরিয়ার প্রশস্ত ময়দান এবং ভারতবর্ষের উর্বর ভূমি অতি নগণ্য। যদি মানব দিলে নেক ইরাদা সঠিক সংকল্প ও কল্যাণের আসক্তি অংকুরিত হয় এবং তা ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হয় এবং তার পরিচর্যা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং মানুষের তুচ্ছ খায়েশাত ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলি দিতে সক্ষম হয় তাহলে মানুষ তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের উর্বর দিলে নেক এরাদার দৃষ্টিনন্দিত উদ্যানে পরিণত হয় এবং তা থেকে সুস্বাদু ফল পাওয়া যেতে পারে। 'আর যদি মানুষের দিল বাঞ্জা, অনুর্বর হয় তাহলে সেখানে কণ্টক বিশিষ্ট তরুলতা ও গাছ-গাছড়া জন্ম নিবে। সেখানে কোন নয়নাভিরাম পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে না। এ দিলে তলোয়ারের আসক্তি সৃষ্টি হতে পারে, নিরাপত্তার দেওয়ার ভাবনা উদয় হতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে মানুষের দিলের ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে এবং এমনভাবে উল্টোপাল্টো হয়ে গেছে যে, সেথায় বিষতো উৎপাদন হতে পারে কিন্তু বিষের প্রতিকার উৎপাদন হতে পারে না। নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে পারে না। হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বলতে পারে কিন্তু মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে না, নিজের বাচ্চাদের উদরপূর্তির জন্য অনাথ এতিমদের পেট চিরতে পারে কিন্তু কোন অনাথ অসহায়, মজুলম ও মসিবতগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতা নিরাপত্তা দিতে এবং কোন এতিমের মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতে প্রস্তুত নয়।

যদি দুনিয়াকে জান্নাত সাদৃশ বানানো হয় আর দিল যদি খারাপ হয় তাহলে দুনিয়া জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডতে পরিণত হয় ঃ

যদি মানুষের স্বভাব চরিত্র এমন হয় যে, তার পিপাসা শবরত দ্বারা নিবারণ না হয়, সুপ্রেয় তৃষ্ণা নিবারণকারী দুধ দ্বারা তার তৃষ্ণা নিবারণ না হয়, তার তৃষ্ণা যদি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা নিবারণ না হয়, তার পিপাসা যদি দাজলা ও ফোরাতের পানি দ্বারা না মিটে বরং তার পিপাসা যদি মানুষের রক্ত পান করার মাধ্যমে নিবারণ হয় তাহলে এমতাবস্থায় যদিও মানবগোষ্ঠী চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ

নক্ষত্রে পৌঁছে যায় যেখানে পৌঁছার জন্য এবং সেখানের আলো বাতাসের এবং তার পৃষ্ঠ দেশে নিজেদের বাসভূমি বানানোর চেষ্টা করছে আর এ চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র দুনিয়ার বুকে নেমে এসে মানুষের পদতলে লুটিয়ে পড়ে এবং গোটা বিশ্ব জান্নাতের নমুনা সাদৃশ্যে পরিণত হয় কিন্তু যদি মানুষের দিল খারাপ থাকে এবং তা থেকে কল্যাণের যোগ্যতা হারিয়ে যায় তাহলে মনে রেখো মানুষের ভাগ্যে তাবাহি-বরবাদি, ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই। এ অবস্থা পরিবর্তন হবার নয়, এবং এ দুনিয়া মানুষের হাতেই জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে।

দিলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ঃ

আজকের বিশ্বে সর্বত্র বিস্তৃত ফ্যাসাদ, নিরাপত্তাহীনতা এবং ভয়ংকর যুদ্ধের যে দামামা বেজে উঠেছে তা দূর করার জন্য এবং মানুষকে নিরাপত্তা, শান্তি, পারস্পরিক মহাব্বত, সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক আস্থার সাথে জীবন যাপন করার জন্য প্রয়োজন হল মানুষের দিলের ক্ষেতে হাল চালাতে হবে। আপনারা কৃষকদেরকে দেখেছেন তারা আল্লাহ তায়ালার জমিনে সঠিক ও স্বাভাবিক নিয়মে হাল চালায়। ফলে ক্ষেতে রবিশস্য ভরে ওঠে। এভাবেই যদি মানুষের দিলের ক্ষেতে হাল চালানো হয় এবং নবীদের প্রদর্শিত পথে তাকে আবাদ করার চেষ্টা করা হয়, আর এক্ষেতে সামান্য মেহনত করা হয় তখন আপনারা দেখবেন দিলের ক্ষেত ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তখন আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন দুনিয়ার চিত্র কি ঘটতে পারে? এ সাধারণ জমিন যা আপনারা নিয়মিত পদদলিত করেছেন, তা থেকে আপনারা এত বড় ফায়েজ, বরকত ও আল্লাহ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হচ্ছেন। সুতরাং যদি আপনারা দিলের ক্ষেতকে নবীদের প্রদর্শিত পথে হাল চালান এবং তাদের প্রশিক্ষিত নিয়ম অনুযায়ী দিলের পরিচর্যা করেন তাহলে সে উদ্যানে পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে এবং সে ক্ষেতে রবিশস্যে ভরে উঠবে। আর আপনারা তখন দুনিয়াতে শোভাময় ও দৃষ্টিনন্দিত দৃশ্য পরিলক্ষিত করবেন। যখন দিলের ক্ষেতিতে নয়াভিরাম ফসলের দৃশ্য দেখা দিবে তখন দুনিয়ার আচল মহামূল্যবান মণিমুক্তা দ্বারা শোভামণ্ডিত হবে। তখন দুনিয়াতে অসংখ্য অলি বুযুর্গ জন্ম নিবে। অজস্র মানব সেবক পয়দা হবে। নিঃস্বার্থ ও আত্মোৎসর্গকারী মানুষের আবাস ভূমিতে পরিণত হবে। মানুষের জন্য মানুষ নিজের খুন ও পানিকে এক করে দিবে। তাদের অবিস্মরণীয় কার্যতৎপরতার কথা কল্পনা করাও মানুষের পক্ষে অসাধ্য হয়ে যাবে।

যখন দিলের দুনিয়া বদলে যায় ঃ

তখন কোন মানুষ কল্পনা করতে পারবে না যে, একজন মানুষ কি পরিমাণ নিঃস্বার্থ হতে পারবে। মানুষ কি কখনও অন্যের কারণে নিজের সন্তানকে উৎসর্গ করতে পারে? কখনও কি মানুষ নিজের ওয়াদা পূরণের জন্য নিজের ঘর বাড়িকে উজাড় করতে পারে? এক মজলুমকে বাঁচানোর তাগিদে সপরিবারের মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করতে পারে? মানুষ কি কখনও কল্পনা করতে পারে এক আহত সৈনিক পিপাসায় কাতর মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত তদপুরি সে অন্য আহত সৈনিকের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিজের হাতের পেয়ালা ত্যাগ করতে পারে? দুনিয়ার জ্ঞান-বুদ্ধি এরূপ ঘটনা কল্পনা করতেও অক্ষম। এ সবকিছুই ছিল আল্লাহর নবীদের মেহনতের কারিশমা। তারা মানুষের দিলের ক্ষেতের উপর সঠিক পদ্ধতিতে মেহনত করেছেন এবং মানুষের ভিতরে থাকা আল্লাহ প্রদত্ত সুপ্ত প্রতিভা এবং খাজনাগুলোকে অলংকৃত করার মাধ্যমে বা বিশ্ব মানবতাকে জান্নাতের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

নবীগণ এ জমিনকে ত্যাগ করেছিলেন এবং বড় বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিদের, কেউ ত্যাগ করেছিলেন। কারণ তারা শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য চেষ্টা সাধনা করে থাকেন। নবীগণ তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নাই এবং তাদের পথিকৃৎ হবার দাবিও করেন নাই। বরং তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন–

أنتم اعلم باسور دنياكم -

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়াদি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং তোমরা যারা শিল্পপতি রয়েছো শিল্প ও টেকনোলজিতে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে পারো। যারা কৃষক শ্রেণী তারা কৃষিক্ষেতে উন্নত ও অগ্রগতি সাধন করতে পারো। যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে রয়েছে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধনা করতে পার কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে ভিন্ন একটি ময়দান ও ভিন্ন কর্মক্ষেত্র দান করেছেন। আর তা হলো মানুষ ও মানবতার ময়দান। নবীগণ মানুষ ও মানবতার ময়দানে পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করেছেন। ফলে দুনিয়ার চিত্র ও নকশা পাল্টে গেল, এক অবস্থা থেকে ভিন্ন অবস্থার অবতারণা ঘটল। আপনি শুধু এক যুগের ইতিহাস পড়ে দেখতে পারেন। সাহাবায়ে কেরামের যুগকে নিয়ে আপনি গবেষণা করতে পারেন। যখন রসূল (সাঃ কে আল্লাহ তায়ালা একটি সুযোগ দিয়েছিলেন তখন তিনি মানুষের দিলের ক্ষেতে আবাদ করেছিলেন। এ আবাদের ফলে আপনারা দেখুন দুনিয়াতে কেমন বসন্তের হাওয়া বইতে লেগেছিল।

ইরাদা যদি নেক হয় তাহলে বন্ধুর পথ হয় ফুলেল ঃ

সে সময় অসংখ্য সংকট ও সমস্যা ছিল। সভ্যতা সংস্কৃতি ছিল একেবারে সূচনা লগ্নে। মানুষ ও মানবতা কোন কিছুই আবিষ্কার করতে সামর্থ হয়নি। সাইন্স তার জীবন যাত্রা শুরু করতে সমর্থ হয়নি, কদমে কদমে ছিল বাধা-বিপত্তি। পথ ছিল দুর্গম ও বন্ধুর। এক জাগায় থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া মানুষের জন্য ছিল কঠিন ও কষ্টকর। কিন্তু যখন মানুষেরর দিলে নেক এরাদা জন্ম নিল, তাদের দিলে মানুষকে অন্ধকার বর্বরতা ও জাহেলিয়াত থেকে নাজাত দেওয়ায় অভিপ্রায় সৃষ্টি হলো। মানুষের দিলে মানুষ তথা তামাম মাখলুকাতের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি করার খাঁটি স্পৃহা তৈরি হলো। এ দেখে যে, মানুষ নিজের অস্তিত্বকে কিভাবে মাটির সাথে ম্লান করে দিয়েছে। মানুষ দেখতে পেল কিভাবে মানুষ জাহান্নামের কুন্ডির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাতে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, " আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি আলো জ্বালিয়ে ছিল আর পঙ্গপাল সে আলোতে ঝাঁপ দিতে লাগল আর উক্ত ব্যক্তি পঙ্গপালকে আগুন থেকে সরাবার চেষ্টা করতেছিল। কিন্তু সে পঙ্গপালকে আগুন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছিল না।"

ঠিক তদ্রূপ মানুষ পঙ্গপালের মত জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আর তাকে ঝম্প দিয়ে আত্মাহুতি করতে উদ্যত ছিল। তখন আমি তোমাদের কোমর ধরে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম। সাহাবায়ে কেরামে (রা:) এর সামনে যখন এ বাস্তবতা উদ্ভাষিত হলো তখন বন্ধুর পথ ও দুর্গম গিরি তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। রাস্তার বিপদ আপদ ও সংকট তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে বিলম্বিত করতে পারল না এবং তাদের দৃঢ় সংকল্পকে দুর্বল করতে সক্ষম হলো না। কারণ একতো ছিল তাদের নেক এরাদা আর দ্বিতীয় তাদের নেক এরাদা তাদের কার্যশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের নেক এরাদা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দিল ও দেমাগকে প্রভাবিত করে রেখেছিল। এখন তাদের খানাপিনা তাদের কাছে তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের খাবারের লোকমা গ্রহণের সময় মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল যে, আমরা তো খানাপিনায় ব্যস্ত আর আল্লাহর হাজার বান্দা জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। যতক্ষণে আমরা মুখে খাবারের লোকমা রাখব এবং তা ভক্ষণ করার জন্য দেরি করব ততক্ষণে খোদার অসংখ্য বান্দা জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়ে যাবে।

এখন সব কিছুই রয়েছে নেই শুধু দরদ ভরা অন্তর ঃ

আজকে কোন জিনিসের অভাব নেই দুনিয়াতে, কোন জিনিস হারিয়ে যায়নি। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু ভেবে দেখুন! কোন জিনিস আজকে দুনিয়ার হাতে নেই? যদি না থাকে কিছু তা হলো মানুষের নেক এরাদা। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, মানুষের মূল্য ও মূল্যায়ন, নেই মানব ও মানবতার জন্য চিন্তা ভাবনা। বিপদ আজ আপনাদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ নিয়ে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কারও আমজনতা নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই। যদি বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং এ হাইড্রোজেন বোমা এবং এটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তাহলে দুনিয়ায় কি হাশর হবে? এ নিয়েতো বহুত আলোচনা পর্যালোচনা হয়ে থাকে, চারদিকে এর চর্চা হচ্ছে কিন্তু কারও সঠিক দরদ নেই। যে সমস্ত লোক কিছু করতে পারত এবং মানবতাকে তা থেকে নাজাত দিতে পারত। তারাই এ সকল উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করতে অধিক আত্মমগ্ন, ব্যতিব্যস্ত। এ কথা ভাল করে বুঝে নিন যে, নয়া বিশ্বযুদ্ধের জন্য সকল শক্তি এবং দুনিয়ার সকল পরাশক্তি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকে সারা দুনিয়াতে মানব বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরিতে সকলেই প্রতিযোগিতা করছে। কারও এর খারাপির প্রতি ঘৃণা নেই। কারও মানুষের ধ্বংসের জন্য ব্যথাও অনুভব হয় না। আসলে প্রত্যেকেরই এ জন্য খাঁটি ব্যথা ও বেদনা অনুভব করা উচিত ছিল। যেমন বাপ ছেলের ব্যথায় ব্যাথিত হয়ে থাকে। ভাই ভাইয়ের দুঃখে কষ্ট অনুভব করে থাকে। এমন ব্যথা মানুষের জন্য আজ কোন মানুষের মাঝে লক্ষ্য করা যায় না । ব্যথার কথা শুধু মানুষের মুখেই রয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে এশিয়ার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আপনি চলে যান, সর্বত্র আপনি কথার ফুলঝুরি শুনতে পারবেন। কিন্তু তাদের মাঝে ব্যথা অনুভব করবেন না। অথচ উচিত ছিল ব্যথা ও বেদনায় ছটফট করতে থাকা, কিন্তু এ অবস্থা আপনি কারও মাঝে দেখতে পাবেন না। তাদের মাঝে রয়েছে পুরাটাই বুদ্ধি-বিবেচনা, দুনিয়ার বিপদ আপদ সম্পর্কে জানা এবং তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা। তাদের অবস্থা দেখে মনে হবে তারা কোন ফ্যাক্টরিতে কোন জিনিসের এক একটি পার্ট পৃথক করছে। হিন্দিকে চিন্দি করে তারা আপনাকে বলবে যে, বিপদ আসন্ন, সংকট মাথার উপরে কিন্তু এক্ষেত্রে মানবতার জন্য যে দরদ থাকা দরকার ছিল, ব্যথা ও বেদনায় দিল চুপসে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা হয় না। তারা যেমন ঘরের কোন ঘটনা বর্ণনা করার সময় তাদের আওয়াজের পরিবর্তন ঘটে, চোখ পানিতে ছলছল করতে থাকে, দিল কাঁপতে থাকে, অবস্থা দেখে মনে হয় যে তার দিল বিষাদ সিন্দুতে পরিণত হয়েছে,

তেমনটি হয় না। আজকে দুনিয়ার বড় বড় দার্শনিক অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে দুনিয়ায় বিপদের কথা বর্ণনা করে। তার অবস্থা দেখে মনে হয় যেন, যেকোন সুখকর খবরের সুসংবাদ দিচ্ছে। কোন ধন্যবাদ পাওয়ার মত ঘটনার বিবরণ তুলে ধরছে। ফলে সে অত্যন্ত মজা নিয়ে ও আগ্রহ ভরে বর্ণনা করছে। এর কারণ হলো যে, মানবতার সাথে তার বাস্তবিক ও আত্মিক কোন সম্পর্ক নেই। যতটকু আছে তা ভাষার ফুলঝুরি এবং দেমাগী আয়েশের জন্য।

আজ দুনিয়ার সকল কর্মই পূরণ করা হচ্ছে। করার সব কিছুই আমাদের রয়েছে যদি আমরা নেক বনতে চাই। যদি আমরা মানুষের খেদমত ও সেবা করতে চাই, যদি আমরা মানুষকে বিপদ থেকে মুক্তি দিতে চাই, যদি এক ব্যক্তি উত্তর মেরুতে আর অপর ব্যক্তি দক্ষিণ মেরুতে থাকে আর আমরা তার সাহায্য সহযোগিতা করতে চাই, তাহলে আল্লাহ তায়ালা সকল উপায় উপকরণ দান করবেন যেন আমরা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে সক্ষম হই। কিন্তু আমাদের মাঝে খাঁটি এরাদা নেই। আমাদের মাঝে এর আগ্রহ নেই। এক ব্যক্তির কাছে সব কিছু আছে যে লাখ লাখ টাকা দ্বারা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সে যদি কৃপণ ও বখিল হয় তার যদি পয়সার মহব্বত থাকে অথবা সে যদি অলস ও আতুর হয়, সে যদি হাত পা নাড়াতে না চায় তাহলে তার এ সম্পদ কি কাজে আসবে? এক ব্যক্তি হজ্জ করতে পারে আল্লাহ তায়ালা তাকে হজ্জ করার সামর্থ দান করছেন কিন্তু সে যদি হজ্জের নিয়ত না করে তার দিলে যদি হজ্জের ইচ্ছা পয়দা না হয় তাহলে আপনারাই বলুন তাকে হজ্জ করাতে কে উদ্বুদ্ধ করবে?

মানুষ সব কিছু করতে পারে কিন্তু করার ইচ্ছা নেই ঃ

এভাবে আজকে মানুষ নেককাজ করার, মানুষের খেদমত করার এবং এ দুনিয়াকে শান্তি ও নিরাপত্তার পুষ্পদানে পরিণত করতে পারে। দুনিয়াকে জান্নাত সাদৃশ্য বানাতে সক্ষম। দুনিয়াকে মসজিদ ও ইবাদতগাহ হিসেবে গড়ে তুলার যেমন সুবর্ণ সুযোগ ও সহজ রাস্তা এ সময় রয়েছে এমন কখনও ছিল না। আজকে দুর্ভাগ্যবশত মানুষ সব কিছু করতে পারে কিন্তু করার ইচ্ছা নেই। কেন করার ইচ্ছা নেই? কারণ এর লাভ ও উপকার তার সামানে নেই। তার ফায়দা তার সামনে নেই কেন? এর কারণ হলো একীন সামনে নেই। বর্তমানে মানুষ নিজের স্বার্থ সিদ্ধি, নিজের উদরপূর্তি, দেহের আরাম-আয়েশের, নিজের অনুভূতি ও নিজের ব্যক্তিগত এবং সন্তানদের স্বার্থ ও আরাম-আয়েশ ছাড়া সব কিছুই ভুলে গেছে। এখন আমার কাছে বিপদজনক মনে হয়, যদি আমাদের জীবন একটু দীর্ঘায়িত হয় এবং আমরা আরও কিছুদিন জীবন লাভে ধন্য হই তাহলে এমন

সময় দূরে নয় যে মানুষ নিজের সন্তানকেও ভুলে যাবে। তখন সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিত্ব প্রিয়তা এবং নিজের আকুণ্ঠ সত্তার মাঝেই কেন্দ্রিভূত হওয়ার জন্য অতি দ্রুত গতিতে মানুষ উন্নতি সাধন করবে। যদি এ গতি চালতে থাকে তাহলে অতি সত্তর আমরা দেখতে পাব যে, পিতামাতা নিজের সন্তানকে ভুলে গেছে এবং শুধু নিজের উদরপূর্তির ধান্ধায় আত্মনিয়োগ করবে। শিশু বাচ্চারা যদি ক্ষুধার্ত থাকে এবং এ কারণে বিলাপ করে ক্রন্দন করতে থাকে তদুপরি মা-বাবা তার শিশু সন্তানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। দুনিয়া যেখানে জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করার ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করছে এবং নবীদের শিক্ষা তাদেরকে তাদের অপকর্মের ব্যাপারে বাধা দেওয়ার জন্য সেখানে বিদ্যমান নেই, এমন কি হযরত ঈসা (আ.)-এর বিকৃত ও অবশিষ্ট শিক্ষা এবং ইঞ্জিলের শিক্ষাও সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, সে সব দেশে মানুষের অবস্থা হলো এই যে, সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বুঝে না। বরং সেখানে এমন লোকও রয়েছে যাদের নিজের ব্যাপারেও হুঁশ নেই। তাদের ব্যাপারে কোরআন শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

نَسُوْا اللّٰه فانساهم اَنْفُسَهُمْ -

অর্থ ঃ "তাঁরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন।" তাদের থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, এ ধরনের মানুষের নিজের ব্যাপারে সঠিক হুঁশ ও জ্ঞান নেই। অর্থাৎ পেটের ব্যাপারে তো হুঁশ আছে কিন্তু নিজের ব্যাপারে কোন হুঁশ জ্ঞান নেই।

মোটকথা, আসল বিষয় হলো মানুষের এবং মানুষের সাথে যা কিছু ঘটে তা হলো তার দিল ও তার দিলের সাথে সম্পৃক্ত, তার নেক এরাদার সাথে সম্পৃক্ত। যদি দিলে বিষয়টি উদ্ভাসিত হয় অর্থাৎ যদি দিলে নেক এরাদা পয়দা হয়ে যায় তাহলে তো বলার কোন কিছুই প্রয়োজন নেই। কারণ উপায়-উপকরণতো শুধু নামমাত্র এবং তা মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ এসব উপায়-উপকরণ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি দ্বারা আবিষ্কার করে থাকে।

গলদ রুখই হলো খারাবির উৎস ঃ

বর্তমানে দুনিয়াতে যে সকল বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে তা যেকোন নামেই হোক না কেন তার মূল কারণ হলো যে, মানুষের রুখ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাল থেকে খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। আজ মানুষের কাছে সব ধরনের শক্তি সামর্থ রয়েছে। কিন্তু তা গলদ রাস্তায় ব্যবহার হচ্ছে। তা প্রতিনিয়ত সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং

তার গতি কখনো থেমে নেই। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, সকল শক্তি প্রথমত ধীরগতিতে চলত কিন্তু এখন তীব্র ও প্রবলগতিতে দৌড়াতে শুরু করেছে। আর এখন তো উড়তে শুরু করেছে। কিন্তু যে দিকে তা ধাবমান রয়েছে তা হল খারাপের দিক, মানবতার ধ্বংসের দিক, মানুষকে হত্যা ও বিনাশ করার দিক।

মানুষের সকল সম্পদ আজ রোগাক্রান্ত ঃ

সকলে আজকে মর্যাদার অভিলাষী, ক্ষমতালোভী ও রাজসিংহাসন দখলের চেষ্টায় মত্ত। সকলেই এ ব্যাধিগ্রস্ত। মানবতার সকল শক্তি সামর্থ এ ব্যাধিতেই ব্যয় হচ্ছে। মানবতার সকল ভোগ বিলাসের বস্তু এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ইতিহাসের সকল অধ্যায়, ঘটনাপ্রবাহ, সভ্যতা-সংস্কৃতি এ রোগে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত বরং .....

আমি আপনাদেরকে পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে চাই যে, মানবতার লাশের উপর দাঁড়িয়ে–

اَنَا رَبُّكُمُ الاعلى ـ

অর্থ ঃ "আমি সব থেকে বড় খোদা।" এ শ্লোগান যদি দেয়া সম্ভব হয় তাহলে ডজন নয়, হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রস্তুত রয়েছে এ শ্লোগান দিতে। সুতরাং যদি আল্লাহ তায়ালার এসকল বান্দাদের থেকে এবং জ্ঞানপাপি লোকদের থেকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি দুনিয়াতে মানুষ বসবাস না করে তাহলে তোমরা কিসের উপর রাজত্ব কায়েম করবে? পাথরের উপর, পাহাড়ের উপর, টিলার উপর, ধু-ধু বালুর মরুভূমির উপর রাজত্ব করবে? কিন্তু আজকের মানুষের এসব প্রশ্ন নিয়ে কোন দিলচচপি ও আগ্রহ, উদ্দীপনা নাই। এখন তো শুধুমাত্র হুকুমত ও রাজত্বই লক্ষ্য উদ্দেশ্য, হুকুমতের বিষয় মানুষের দেমাগে এমনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে যে, অধিনস্তদের ফিকির তাদের মাথায় নেই। যদি ক্ষমতার নেশায় মত্ত থাকে তাহলে ফেরাউনকে পবিত্র কোরআনে তাদের জন্য নমুনা স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। যদি দৌলতের নেশায় মত্ত থাকে তাহলে তাদের জন্য কারুনকে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। আর যদি মন্ত্রিত্বের নেশা থাকে তাহলে তাহলে হামানকে নমুনা স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। দুনিয়ার সামনে এ তিনটি জীবন্ত ইতিহাস ফেরাউন, হামান এবং কারুন, এদের মিলমিশা কখনও শেষ হবার নয়। কিন্তু পার্থক্য হলো ফেরাউনের কাছে ক্ষমতার সকল দাপট ও উপায় উপকরণ ছিল, আর আমাদের কাছে রয়ে গেছে মুখের বুলি।

আজ মানুষ নিলামে বিক্রয় হচ্ছে ঃ

কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে স্বীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার মত কোন সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ নেই। আজকে সারা দুনিয়ার মানুষ ফেরাউনী রাস্তার পিছনে চক্ষু বন্ধ করে ছুটছে। ফলে মানুষ ফুটপাতের উপর তরমুজ ও শাক সব্জির মত বিক্রয় হচ্ছে। পার্টি পরিবর্তন করছে, আক্বীদা বিশ্বাসকে ছেড়ে দিচ্ছে। সারা জীবনের গৌরবোজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় কৃতকার্যকে ধুলায় ধূসরিত করছে। আজকে মানুষ এক সংঘঠন ত্যাগ করে অন্য সংগঠন ও অন্য মতাদর্শ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। যাদের সাথে ছিল তার সারা জীবনের জিগরি দস্তি, আন্তরিক ভালবাসা এসব বন্ধুত্ব গুটিয়ে নিয়ে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে প্রস্তুত যাদের সাথে ছিল তার দুশমনী ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব। যাদেরকে সে জীবনভর মন্দ বলেছে, গালি দিয়েছে, পদদলিত করতে প্রস্তুত ছিল, যাদেরকে কখনও সে ভাল চোখে দেখেনি এবং ভাল বলতে প্রস্তুতও ছিল না আজকে তাদেরকে মাথার মুকুট এবং চোখের মণিতে পরিণত করেছে।

আবার যারা ছিল তার কাছে গোলাপফুলের মত পবিত্র, মাথার মুকুট এবং চোখের মণি এখন তাদেরকে পদদলিত করতে প্রস্তুত। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং কঠিন থেকে কঠিন ও নির্দয় আচরণ করতে প্রস্তুত। তাদেরকে যদি এসবের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়..... আর যদি তারা সত্য কথা বলার হিম্মত ও সৎসাহস রাখে এবং তারা যদি মুনাফেক না হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে বলতে শুনবেন যে এসব কিছুই দিলের অবস্থান। সেখানে ফেরাউন উপবিষ্ট আর তার কারণেই দুনিয়া ফ্যাসাদ ও অগ্নিগর্ভে পরিনত হয়েছে।

ফ্যাসাদ ও বিগাড়ের মূল ধর্ম নয় ঃ

দুনিয়াতে ফ্যাসাদ ও বিগাড়ের মূল ধর্ম নয়। দুনিয়াতে আজকে যে ফ্যাসাদ ও অবিচার চলছে তার কারণ, ধর্মের সাথে ধর্মের যুদ্ধ নয়, ধর্মীয় সহিংসতা ও ধর্মীয় যুদ্ধের যুগ শেষ। শত-শত বছর পূর্বে তা শেষ হয়ে গেছে। আজকে বেচারা ধর্মকে ময়দানে এসে যুদ্ধ করার সুযোগ কে দিতে চায়? মূলত আজকের বিশ্বে ধর্মহীন মানুষ ধর্মহীন মানুষের সাথে সংঘাত ও সংঘর্ষ করছে। আজ স্বার্থপরায়ণতা স্বার্থপরায়ণতার সাথে লড়াই রত। আজ লোভ-লালসা লোভ-লালসার সাথে সংগ্রাম রত। আজ শয়তান শয়তানের সাথে ধসতা-ধসতি করছে। আজ ধন-সম্পদ ধনসম্পদের সাথে টক্কর দিচ্ছে। আজ নেতৃত্বের সাথে নেতৃত্বের সংঘাত চলছে। আজ হুকুমতের সাথে হুকুমতের, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের, মন্ত্রিত্বের সাথে মন্ত্রিত্বের, দলের সাথে দলের লড়াই চলছে।

গোটা লড়াই স্বার্থপরায়ণতার ঃ

আপনারা বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক চিত্র দেখেছেন। সেখানে কোন ধর্মের সাথে লড়াই ছিল? তা কি ক্রুসেড যুদ্ধ ছিল নাকি ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের সংঘাত? কখনই নয়! বরং এক্ষেত্রে ধর্ম ছিল পূর্ণ দোষমুক্ত। এটাকে ধর্মের সৌন্দর্যও বলা যেতে পারে আবার ধর্মের দুর্বলতাও। এটা আমার আলোচনার বিষয় নয়, ধর্ম আজকে এ পজিশনে নেই যে, তা অন্য ধর্মের সাথে যুদ্ধ করবে। ন্যায়নিষ্ঠার ও আন্তরিকতার সাথে কখনও ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দ্বন্দ্ব হয় না। রুহানীয়াতের সাথে কখনও রুহানীয়াতের ঝগড়ার অবতারণা হয় না। এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা অপবাদ ও মনগড়া কথা। আমি ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ও ইতিহাসবিদ প্রফেসরদেরকেও চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে, তারা প্রমাণ করুক একবারের জন্যও কি ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংঘাত হয়েছে? ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার লড়াই করার যোগ্যতাই নাই। ন্যায়নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা যখন ঠিক ঐভাবেই ন্যায়নিষ্ঠাকে চিনতে পারবে তখন তাকে বরণ করবে যেভাবে ভাই ভাইকে চিনে বরণ করে, নেকী নেকীকে চিনে বরণ করে। মা ছেলেকে চিনে কোলে তুলে নেয়। ছেলে মাকে চিনতে পেরে গ্রহণ করে নেয়। এ থেকেও অধিক এক মুখলেসও আন্তরিক ব্যক্তি অপর মুখলেস ও আন্তরিক ব্যক্তিকে চিনতে সক্ষম হয় এবং তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং কখনই আন্তরিকতা আন্তরিকতার বিরুদ্ধে, রুহানীয়াত রুহানীয়াতের বিরুদ্ধে, নেকী নেকীর বিরুদ্ধে, সততা সততার বিরুদ্ধে কখনই সংঘাত ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে না। বরং সব সময় মিথ্যার সাথে মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলেছে, সব সময় মুনাফিকির সাথে মুনাফিকির পাঞ্জা পরীক্ষা চলেছে। সব সময় বাতিলের সাথে বাতিলের সংঘাত বেধেছে। সব সময় স্বার্থপরায়ণতার সাথে স্বার্থপরায়ণতার মল্ল যুদ্ধ বেধেছে।

আমরা আজকে দুনিয়াতে যত ফ্যাসাদ দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ফ্যাসাদের মূল হল স্বার্থপরায়ণতা। স্বার্থপরায়ণতা ছাড়া এ দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদের আর কোন মৌলিক কারণ নেই। আমেরিকাতে আজ স্বার্থের লড়াই, ইউরাপে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের ভারত উপমহাদেশে তথা ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এ স্বার্থপরায়ণতারই দ্বন্দ্ব চলছে। আজ সারা দুনিয়াতে স্বার্থপরায়ণতার কর্তৃত্ব চলছে। যদি আজকে দুনিয়াতে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকট দেখা দেয় তাহলে এর পিছনে দায়ী স্বার্থপরায়ণতা। যদি মানুষ কাপড়ের অভাবে বিবস্ত্র

জীবন যাপন করে থাকে তাহলে এর পিছনে দায়ী হল মানুষের স্বার্থপরায়ণতা। কারণ আজকে মানুষ মানুষের রক্তলোভী। আজকে সারা বিশ্বে যত জাতিগত দাঙ্গা চলছে তাও এ স্বার্থপরায়ণতার কারিশমা। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, এসব ক্ষেত্রেই ধর্মকে বদনাম করা হচ্ছে অথচ ধর্ম এসব থেকেই মুক্ত।

মুক্তির একটি মাত্রই পথ ঃ

আমি স্পষ্টভাবেই বলতে চাই যে, এসব সহিংসতার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। হিন্দু-ধর্মেরও কোন সম্পৃক্ততা নেই। খ্রিস্টধর্ম এ থেকে মুক্ত। আমি একজন ধার্মিক ও ন্যায়নিষ্ঠা পছন্দকারী ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা দিতে চাই যে, এসব সহিংস দাঙ্গায় ধর্মের কোন হাত নেই। আহমেদাবাদে যে সহিংসতা ঘটছে তা ছিল শুধুমাত্র স্বার্থের লড়াই। সে সকল দাঙ্গাবাজদের মাঝে ছিল মানবদুশমনি যা সহিংসতারূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আজকেও যখনই কোথাও সহিংস দাঙ্গা হয়, রক্তের স্রোতধারা বইতে থাকে, যেখানে রক্ত নিয়ে হলি খেলা বা রক্তের হলি খেলা হয়, যেখানে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করে, যেখানে মানবতা পদদলিত হয়, যেখানে ঘর বাড়িকে অগ্নি সংযোগ করা হয়, গ্রামের পর গ্রামকে উজাড় করে বিরাণ ভূমিতে পরিণত করা হয়, এ সব জায়গাতেই স্বার্থপরায়ণতাই হলো মূল কারণ। আর এ ধারাবাহিকতা কখনও বন্ধ হবার নয়। এ ধারাবাহিকতা বন্ধ করার শক্তি দুনিয়ার কোন দার্শনিকের কাছে নাই। এ সহিংসতা বন্ধ করার শক্তি কোন চিন্তাবিদও বুদ্ধিজীবীদের কাছে নেই। কারণ, মুক্তির রাস্তা হারিয়ে গেছে এবং মুক্তির দুয়ার বন্ধ হয়ে রয়েছে। মানবতার ভাগ্যে মহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি মুক্তির একটি পথ এবং একটি দরজা খোলা রয়ে গেছে। আর তা হলো নবীগণের প্রদর্শিত পথ।

হে ইউরোপের বুদ্ধিজীবীগণ, হে আমেরিকার গবেষকগণ তোমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছ যে রাস্তা ঈসা (আ.) তোমাদেরকে দেখিয়েছিল। যতদিন মুহাম্মদ (সা.) নবুয়ত লাভে ধন্য না হয়েছিল ততদিনতো হযরত ইসা (আ.)-এর প্রদর্শিত পথ গন্তব্য পৌছার জন যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হে বুদ্ধি ও মানবতার দুশমন! তোমরা ঈসা (আ.)-এর শিক্ষার আঁচল ছেড়ে দিয়েছে। তোমরা গির্জার বিরুদ্ধে অসংখ্য অপবাদ ও প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছ, হয়ত গির্জার মাঝে অসংখ্য খারাপি রয়ে গেছে। হয়তো গির্জা অগণিত ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু এসব বিশ্ব যুদ্ধের জন্য কখনই গির্জা দায়ী নয়। বরং গির্জাতো একাত্বতা সৃষ্টি করেছে, ইউরোপের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে এক সুতোয় বেধেছে। সেখানের অসংখ্য লোক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় যে, যখন দুনিয়াতে লুথরের বিপ্লব— যদিও তা খ্রিস্টান জাতির অনেক

কল্যাণ সাধন করেছে। তখন ইউরোপিয়ানদের শক্তি ও একাত্মতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। একটি বড় গির্জা এবং একজন বড় পোপের পতাকাতলে ইউরোপীয়রা যেভাবে একত্রিত হয়েছিল এবং শতশত বৎসর যাবত তার ইশারায় জীবন-যাপন করত লুথরের বিপ্লব তা ধ্বংস করে দিল। ফলে তাদের মালার সুঁতো ছিঁড়ে গেল এবং তারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। আর আজ এমন কোন শক্তি, এমন কোন দর্শন, এমন কোন বিধান, তা অর্থনৈতিক বিধান হোক অথবা রাজনৈতিক বিধান, চাই তা গণতান্ত্রিক হোক অথবা স্বৈরতান্ত্রিক তাদেরকে পুনরায় একত্র করতে এবং এক শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম নয়।

আমাদের চিকিৎসা আমাদের কাছেই ঃ

দুনিয়ার জানা উচিত যে, আমাদের রোগ-ব্যাধি আমাদের মাঝেই রয়েছে এবং আমাদের চিকিৎসাও আমাদের কাছেই রয়েছে। যে জিনিস আমরা বাইরে ও দূর-দূরান্তে তালাশ করে ফিরছি তা আমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। আমাদের অবস্থা ঐ ঘটনার মত যে, একবার কোন এক ব্যক্তি কোন জিনিস হারিয়ে ফেলেছিল। সে তা কখনও ঘরের ভিতর আবার কখনো ঘরের বাইরে তালাশ করছিল। কেউ জিজ্ঞাসা করল ভাই 'তোমার হারানো বস্তু কোথায় পড়েছে।' সে উত্তরে বলল, 'ঘরের ভিতরেই পড়েছে।' প্রশ্নকারী বলল, তাহলে তুমি তা ঘরের ভিতরে কেন তালাশ করছ না? উত্তরে সে বলল, ঘরের ভিতরে আলো নেই অন্ধকার, 'বাইরে আলো থাকায় বাইরেই তালাশ করছি'। বর্তমান সারা দুনিয়ার পরিস্থিতি এমনই ঘটছে। বাস্তবতা হারিয়ে গেছে আমাদের দিলের মাঝে আমাদের অস্তিত্বের মাঝে, আমাদের এরাদা ও সংকল্পের মাঝে। অথচ আমাদের একীনের মূল উৎস তার মাঝেই রয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু এসকল ক্ষেত্রে অন্ধকার বিরাজমান। ঈমান না থাকার অন্ধকার, নবুওয়াতি শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার অন্ধকার। আর মৌলিক বিষয় হলো হারিয়ে যাওয়া বস্তু সেখানেই পাওয়া যায় যেখানে তা পড়েছে, যদিওবা আলোর ব্যবস্থা না থাকে। সুতরাং তোমার যে জিনিস ঘরের ভিতর হারিয়ে গেছে বাইরে তা তালাশ করো না ঘরের ভিতর আস, চেরাগ জ্বালাও। ঈমানের মশাল চেয়ে আনো, কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে ঘরের ভিতর ফিরে আস এবং হারিয়ে যাওয়া বস্তু ঘরের ভিতরে যেখানে পড়েছে সেখানেই তালাশ কর। এটাই আল্লাহ তায়ালার বিধান এবং বুদ্ধির পরিচয় যা যেখানে পড়ে সেখানেই পাওয়া যায়।

ঈমানের রশ্মিই হলো দুনিয়ার একমাত্র চিকিৎসা ঃ

তোমরা দিলের একীনকে হারিয়েছ, তোমরা দিলের মাঝে মানুষের ভালবাসা হারিয়েছে, তোমাদের দিল ঈমান হারা হয়ে গেছে। তোমাদের দিল মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়েছে, তোমাদের দিল আল্লাহর মুহাব্বত শূন্য হয়ে গেছে। আর এখন তা তালাশ করছ বাইরের জগতে। তোমরা তা তালাশ করছ জাতিসংঘের প্লাটফর্মের মাধ্যমে। তোমরা তা তালাশ করছ রাজনৈতিক সমাবেশের মাধ্যমে। তোমরা তা তালাশ করছ রাজনৈতিক পার্টির মাধ্যমে, তোমরা তা তালাশ করছ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেমিনার হলগুলোতে, তোমরা তা তালাশ করছ লাইব্রেরীর বুকসেল্‌ফগুলোতে। অথচ আল্লাহর বিধান এবং আল্লাহর ফয়সালা হল এই যে, যে বস্তু যেথায় হারাবে, সেথায় তা পাওয়া যাবে। তোমাদের এ হারানো বস্তু যা তোমরা দিলের মাঝে হারিয়েছ এবং তোমরা অবগত যে, তা তোমরা হারিয়েছ, তোমাদের জানা আছে তোমরা কখন তা হারিয়েছ এবং কোন সময় হারিয়েছ, তোমরা পতিত হবার শব্দ শুনেছিলে। কারণ কাঁচ পড়লেও তার শব্দ হয়। এ হারিয়ে যাওয়া বস্তু এমন নয় যে, তা কোন মরুভূমিতে হারিয়েছে এবং তার শব্দ শোনা যায়নি। বরং পতিত হবার সময় তার ঝংকার এসেছিল এবং ঘোষণা দিয়েছিল যে, আমি চলে যাচ্ছি। ঈমান যখন হারিয়ে যাচ্ছিল তখন তার পতিত হবার শব্দ ও গুঞ্জরণ তোমাদের কানে এসে পৌছে ছিল। মুহাব্বত যখন হারিয়ে যায় তখন তার আওয়াজও এসেছিল এবং চিৎকার দিয়ে বলেছিল- আমি বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি। নবুওয়তের আঁচল যখন তোমাদের হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল তখন তোমরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলে এবং কেউ কেউ তোমাদেরকে সে ব্যাপারে সতর্ক করে ছিল কিন্তু তোমরা তা শ্রবণ করেও না শুনার ভান করেছিলে।

ইউরোপের বুদ্ধিজীবীগণ! সে সময় তোমরা এমন শোরগোল শুরু করেছিলে, এমনভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়েছিলে, যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছিলে যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রদত্ত উপহার হারিয়ে যাচ্ছিল এবং জমিনের উপর পতিত হয়ে তা তোমাদিগকে আওয়াজ দিয়েছিল আর তোমরা সে আওয়াজের প্রতি কর্ণপাত করনি। কিন্তু আজকে মুসলমানরা তোমাদেরকে অবহিত করতে চায় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রদত্ত উপহার তোমরা কোথায় হারিয়েছ। যারা তা তালাশ করতে চায় যেখানে পতিত হয়েছে সেখানেই পেতে সক্ষম আবেহায়াতের ঝর্নাধারা ওখানেই পাওয়া যায় যেখানে তা রয়েছে। আর তা অন্ধকারের মাঝেই পাওয়া যাবে, তবে তাকে অন্ধকারের মাঝেই যেতে হবে। প্রথমে তার সামনে অন্ধকার পড়বে অতঃপর যে আবেহায়াতের ঝরনাধারা পেয়ে ধন্য হবে।

বর্তমান দুনিয়ার কোন চিকিৎসা নেই। যারা শ্রবণ করতে চাও তারা ভাল করে শ্রবণ করে নাও, যারা লিখতে চাও তারা ভাল করে লিখে নাও, আর যারা ইয়াদ করছে তারা ভাল ইয়াদ করে নাও যে, দুনিয়ার কোন চিকিৎসা নেই। চিকিৎসা যদি থেকে থাকে তাহলে তার একমাত্র চিকিৎসা হলো রসূল (সা.) এর নবুওয়াতি শিক্ষাকে মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরা। তা হলেই চেরাগ প্রজ্জ্বলিত করা সম্ভব হবে যা দ্বারা দিলের হারানো বস্তু পাওয়া সম্ভব। কারণ দিলের চাবি হারিয়ে গেছে কিন্তু দিল পর্যন্ত পৌছার রাস্তা কারও জানা নেই। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো যে, দিলের রাস্তা কোন রাজপথ নয় বরং তার পথ হলো অত্যন্ত নাজুক। এ অত্যন্ত সংকীর্ণ গলি। কিন্তু দিল পর্যন্ত পৌছার এটিই একমাত্র পথ।

দেমাগের ভাষা অসংখ্য কিন্তু দিলের ভাষা একটি মাত্র ঃ

আপনারা শুনে রাখুন যে, দেমাগের অসংখ্য ভাষা রয়েছে কিন্তু দিলের একটি মাত্র ভাষা। দেমাগ ইংরেজি জানে, ফ্রান্স ভাষা বুঝে, আরবি ভাষা বুঝে। দেমাগকে বুঝাবার জন্য অত্যন্ত উঁচুমাপের বক্তৃতা এবং অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয় এবং অত্যন্ত পাণ্ডিত্যময় দর্শনপূর্ণ আলোচনা করা হোক না কেন দেমাগ তা বুঝতে সক্ষম। কিন্তু দিল একটি মাত্র ভাষা জানে, দিল ইনসাফের ভাষা বুঝে, দিল মহব্বতের ভাষা বুঝে, কিন্তু দিল..... দার্শনিকদের ভাষা বুঝতে সক্ষম নয়। সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে সক্ষম নয়। সায়েন্স বুঝতে সক্ষম নয়। দিল শুধু বুঝে ঈমানের ভাষা। দিলের কাছে যদি আল্লাহ তায়ালার নাম নেওয়া হয় তাহলে সে জেগে উঠে, আল্লাহর নামে তাকে ডাক তাহলে সে ছুটে আসবে। খোদার নামের দোহাই তার কাছে দাও তাহলে সে সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাই দিল যদি কোন কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে কোন জিনিসের অভাব রইবে না। কোন সাজ-সরঞ্জাম ও উপায় উপকরণের ঘাটতি রবে না, শক্তি সামর্থের কমতি রবে না। সাংগঠনিক শক্তির স্বল্পতা উপলব্ধি হবে না, ধন-সম্পদের ঘাটতি রবে না। জ্ঞান বুদ্ধির কমতি রবে না বরং সব কিছু তার পদতলে এসে আত্মোৎসর্গ করবে। সুতরাং দিলকে জাগ্রত কর দিলকে পুনরায় কল্যাণের রাস্তায় উৎসর্গ কর। দিলে মানুষের মহাব্বত সৃষ্টি কর, দিলের অনুর্বর ও বাঞ্জার ভূমিতে আবার উৎপাদনের যোগ্যতা সৃষ্টি কর। আর এসব যোগ্যতা সৃষ্টি হবে না যদি দিলের হীন স্বার্থ ও ইতর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কোরবানী না দেওয়া হয়। তোমাদের এ দৌলত পূজা, তোমাদের মান-সম্মানের আসক্তি, তোমাদের এ স্বার্থ পূজা তোমাদের এ রাষ্ট্র পূজা, এসব কিছুই দিলের খাদ ও ময়লা। যদি

দিলের এসব ময়লাকে ধরণীর বুকে সার হিসেবে ব্যবহার কর তাহলে দিলের ক্ষেতে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করবে, দিলে খুলুস ও মহাব্বত পয়দা হবে। তোমরা দেখেছ খাদ ও ময়লা সব সময় দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এ খাদ ও ময়লা থেকে যে জিনিস উৎপাদিত হয় তা অত্যন্ত কামনীয়, আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দিত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি লক্ষ্য উদ্দেশ্যের খাদ ও ময়লা স্বার্থপরায়ণতার খাদ ও ময়লা, মানব দুশমনির ময়লা, মান মর্যাদার প্রতি আসক্তি এবং হুকুমত পূজার খাদ ও ময়লা দিল থেকে বের করে ধরণীর বুকে নিক্ষেপ কর তাহলে দিলে সদাকাত ও সততা, পেয়ার ও মহাব্বত, ন্যায় ও ইনসাফ পয়দা হবে। মানুষের কল্যাণ কামনার প্রতি আগ্রহী হবে আর তখন দুনিয়াতে পুনরায় বসন্তের সুবাতাস বইতে থাকবে ধূলোর ধরা ভূ-স্বর্গে পরিণত হবে।

শেষ